স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

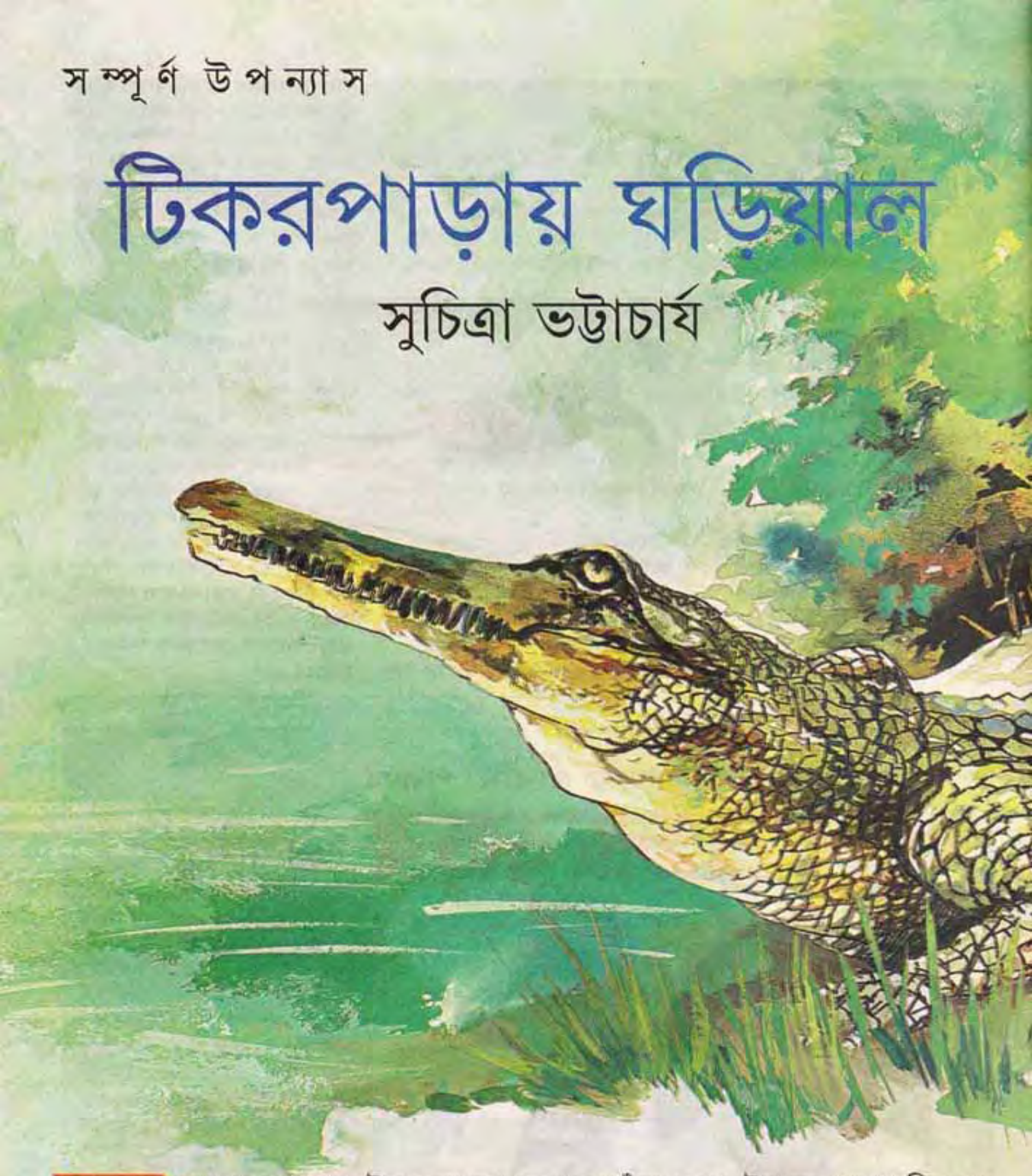

দূরপাল্লার কোনও ট্রেনের কামরা যে এত ফাঁকাও যায়, টুপুরের ধারণা ছিল না। হাওড়া থেকে ছাড়ছে গাড়ি, যাবে সেই অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি। অথচ টুপুরদের টু টিয়ার এসি কোচের খান পঞ্চাশেক বার্থে যাত্রীসংখ্যা কিনা সাকুল্যে দশ! ওঠার সময়ও দেখেছে টুপুর, গোটা ট্রেনটাতেই লোকজন নেই বিশেষ।

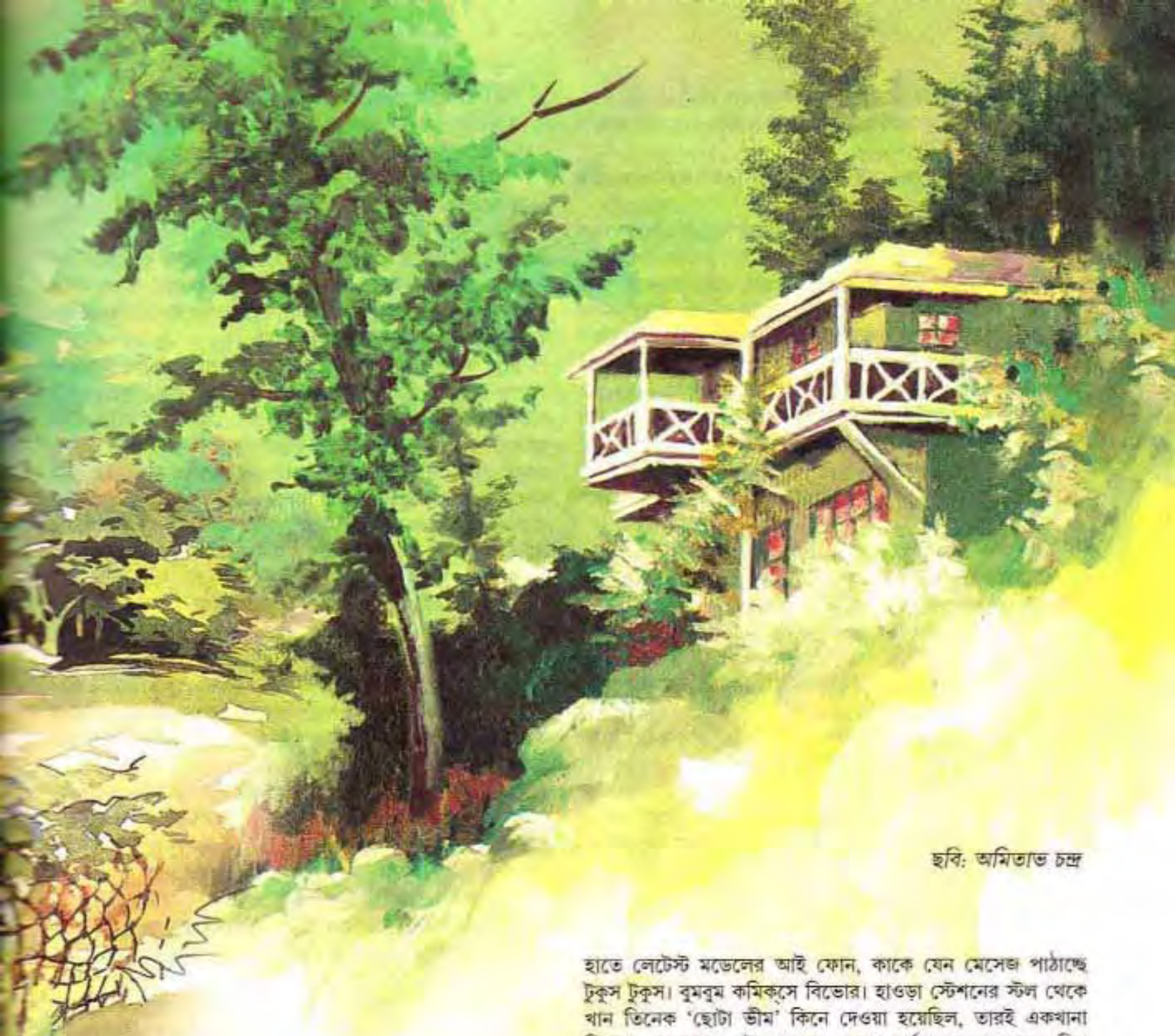

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

এত নির্জন গাড়িতে রাতদুপুরে ডাকাতিফাকাতি হবে না তো? অবশ্য তেমন একটা কিছু ঘটলে তো টুপুরেরই পোয়াবারো। ডাকাতরা আর তাদের কাছ থেকে কী-ই বা নেবে? দু'খানা মোবাইল ফোন, ঘড়ি, কিছু টাকাপয়সা আর পার্থমেসোর দামি ডিজিটাল ক্যামেরাটা। ওই ক্যামেরাখানা পার্থমেসোর প্রাণ। ওটা খোয়া গেলে বেচারা খুব দুঃখ পাবে। তবে ডাকাতরা তো ওইটুকু নেবেই। নইলে তাদেরই বা পোষাবে কেন! তবে ডাকাতদের সঙ্গে যদি মিতিনমাসির মুখোমুখি টক্কর হয়, যে অভিজ্ঞতা টুপুরের ভাঁড়ারে জমবে, তার দাম তো ওই ক্যামেরার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার সূত্রে মিতিনমাসির কাছে আজকাল রিভলভার তো থাকেই। অস্ত্রটা যদি বের করে, কী প্রতিক্রিয়া হবে ডাকাতদলের? পালাবে দুড়দাড়িয়ে? নাকি জোর ফাইট হবে একখানা?

উফ, ভাবতেই রোমাঞ্চ! একটা কাল্পনিক ডাকাতির আশঙ্কায় ফুরফুরে মেজাজ আরও তর হয়ে গেল টুপুরের। জঙ্গল পাড়ি দেওয়ার পথে এমন একটা শিহরন জাগানো চিন্তা মনটাকে যেন টনকো করে দেয়।

জুলজুল চোখে সঙ্গীদের এক ঝলক দেখে নিল টুপুর। মিতিনমাসির হাতে লেটেস্ট মডেলের আই ফোন, কাকে যেন মেসেজ পাঠাচ্ছে টুকুস টুকুস। বুমবুম কমিক্‌সে বিভোর। হাওড়া স্টেশনের স্টল থেকে খান তিনেক 'ছোটা ভীম' কিনে দেওয়া হয়েছিল, তারই একখানা গিলছে গোগ্রাসে। ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত বেজায় ব্যস্ত ছিল পার্থমেসো। ট্রলি সুটকেসগুলো নীচের বার্থের তলায় চালান করে, চেন-তালা লাগিয়ে এখন সে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে এল। প্যান্টশার্ট ছেড়ে পরে নিয়েছে পাজামা-পাঞ্জাবি। এত রাতেও কফি খেল তারিয়ে-তারিয়ে। চলন্ত ট্রেন থেকে মন দিয়ে দেখছে বাইরের অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুরেছে পার্থমেসো। ভুরু নাচিয়ে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবি মনে হচ্ছে?"

টুপুর হাসি-হাসি মুখে বলল, "ট্রেনটা বড্ড চুপচাপ! রাত্তিরে একটা এক্সাইটিং কিছু হলে দারুণ লাগবে, তাই না?"

"কীরকম উত্তেজনা চাইছিস তুই?"

"এই ধরো, ডাকাতি, রাহাজানি গোছের কিছু।"

"যত সব ক্যাডাভ্যারাস চিন্তা," পার্থ ঠোঁট ওলটাল। "তার চেয়ে বরং ভাব, ট্রেন খড়্গপুর পৌঁছলে নেমে ডিমসেদ্ধ খাব, সঙ্গে একটু পুরি-সবজিও চলতে পারে।"

"এক্ষুনি খাওয়া-খাওয়া করছ? এই না হাওড়া স্টেশনে একপ্লেট বিরিয়ানি সাঁটালে?"

"সে তো অলরেডি হজম হতে শুরু করেছে। স্পেসটা আবার ভরাট করতে হবে যে," বলেই পার্থর একগাল হাসি, "কাল থেকে তো জঙ্গলে বাস। পেটে কী পড়বে কে জানে! তার আগে উদরে

যতটুকু যা ভালমন্দ লোড করে নেওয়া যায় আর কী।"

"আমরা কোন ফরেস্টে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু এখনও আমায় বলোনি মেসো!"

"আরে, সে তো জানতেই পারবি। এখন একটু সাসপেন্সে থাক না।"

টুপুরের ভিতরের ছটফটানি যেন আরও বেড়ে গেল। সন্ধে থেকে এই এক ডায়ালগ আওড়ে চলেছে পার্থমেসো। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই, আগাম কোনও জানান দেওয়া নেই, আচমকা আজ বিকেলবেলা টুপুরদের হাতিবাগানের বাড়িতে হাজির। গিয়েই তাড়া লাগাচ্ছে, 'তিন-চার দিনের জাঙ্গল টুর। আজই রাত সাড়ে এগারোটায় ট্রেন, চটপট জামাকাপড় গুছিয়ে নে'। কিন্তু জঙ্গলটা যে কোথায়, হঠাৎ যাওয়াই বা হচ্ছে কেন, কিছুই ঝেড়ে কাশল না এখনও। তবে হ্যাঁ, স্কুলে সবে ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পড়াশোনার চাপ কম, এসময়ে মিতিনমাসির সঙ্গে ছোট্ট একটা ভ্রমণ তো টুপুরের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। সুতরাং, আর কথা বাড়ায়নি টুপুর। পাঁচ মিনিটে তৈরি হল। বাবা-মাকে টা টা করে অবিলম্বে পার্থমেসোর সঙ্গে ফুড়ুৎ।

কিন্তু ট্রেনে চড়ার পরেও এই হেঁয়ালির কী অর্থ?

মেসোকে ছেড়ে মাসিকে ধরল টুপুর। আদুরে গলায় বলল, "কী গো, তুমিও আমার সঙ্গে লুকোছাপা করবে?"

মিতিন মোবাইল থেকে চোখ তুলল। হাসছে মিটিমিটি। বলল, "কৌতূহলে ফুটছিস তো?"

বুমবুম ফস করে বলে উঠল, "আমি জানি আমরা কোথায় যাচ্ছি। কটকে।"

টুপুরের গুলিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, "কটকে তো জঙ্গল নেই।"

"জানিস তা হলে?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "এবার তো তা হলে তোর জিওগ্রাফির ফান্ডাটা একটু পরখ করতে হয়। কটকেই আমরা নামব। তবে জঙ্গলটা সেখান থেকে আরও শ'খানেক কিলোমিটার দূরে।"

"সিমলিপাল?"

"ভূত, সিমলিপাল হলে থোড়াই ট্রেনে চাপতাম! কলকাতা থেকে বম্বে রোড ধরে গাড়িতে চলে যেতাম।"

"তা হলে কি কেওনঝাড়?"

"উঁহু, কেওনঝাড় তো যায় জাজপুর থেকে।"

"বুঝেছি, নন্দনকানন যাওয়া হচ্ছে।"

"তোর মাথা। ওটা একটা জঙ্গল নাকি? জাস্ট ওপেন এয়ার চিড়িয়াখানা। তা ছাড়া নন্দনকানন তো ভুবনেশ্বরে।"

নাহ, আর কোনও জঙ্গলের নাম মনে আসছে না টুপুরের। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আমি পারব না।"

"আর একটু ক্লু দিই?" পার্থ গলাখাকারি দিল। "জঙ্গলটা মহানদীর পারে। নদীর ওপারে ফুলবনি জেলা, এপারে আঙুল।"

ফুলবনি নামটা শোনা-শোনা বটে, তবে আঙুল টুপুরের একেবারেই অচেনা। হতাশ মুখে টুপুর বলল, "সরি। ওড়িশার ম্যাপ আমার মুখস্থ নেই।"

"তুই একটি লেডিজ ফিঙ্গার। সাতকোশিয়ার নাম শুনেছিস?"

"না।"

"ভূগোলে তুই লাড্ডু পাবি। অত বড় একটা ফরেস্ট। বাঘ, ভালুক, হাতি, বাইসন, লেপার্ড, কী আছে, আর কী নেই!"

"আসলটাই তো বললে না," পার্থ মন্তব্য জুড়ল, "ওখানে ঘড়িয়াল সংরক্ষণের চমৎকার বন্দোবস্ত আছে।"

"ঘড়িয়াল?" টুপুর চোখ কুঁচকাল, "মানে যে কুমিরগুলো মাছ খায়?"

"অনেকটা ঠিক বলেছিস। ঘড়িয়াল মাছই খায়। দেখতেও প্রায় কুমিরেরই মতো। তবে ওরা পুরোপুরি কুমির নয়, প্রজাতিটা আলাদা।"

"ও! তা সাতকোশিয়ার জঙ্গলটা কেমন? খুব ঘন?"

"গেলেই দেখতে পাবি।" মিতিন এবার একটু তাড়া লাগাল, "এখন শুয়ে পড় তো দেখি, অনেক রাত হয়েছে।"

"আহ, খড়্গপুরটা যাক না," পার্থ নড়েচড়ে বসল, "ডিমসেদ্ধটা খেয়ে তারপর না হয়...।"

"উঁহু, বাকি রাতটুকু উপোসই থাকো।"

হুকুম জারি করে বুমবুমের হাত থেকে কমিক্‌সের বই কেড়ে নিল মিতিন। রেলের কর্মচারী চাদর, বালিশ, তোয়ালে কম্বল রেখে গিয়েছে। উপরের বার্থে পাতা হল বুমবুমের বিছানা। পার্থও চড়েছে আপার বার্থে, তোড়জোড় করছে নিদ্রার।

টুপুর বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরছে পায়ে-পায়ে। ফাঁকা কুপগুলো দেখতে-দেখতে। হঠাৎ গতি শ্লথ হল সামান্য। একটা কুপে দু'টো গাট্টাগোট্টা লোক এখনও জেগে। তাস খেলছে দু'জনে। টুপুর থমকানো মাত্রই দু' জোড়া চোখ মুহূর্তে তেরচা। দৃষ্টিটা যেন কেমন-কেমন। আর পাঁচটা সাধারণ যাত্রীর মতো নয়। দু'জনেরই চুলে কদমছাঁট, হাতে মোটা স্টিলের বালা। এই চৈত্র মাসেও একজনের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, অন্যজনের ফ্ল্যাপ-হাতা বুশশার্ট। একজনের গোঁফ জোড়া রীতিমতো তাগড়াই, অন্যজনের নিখুঁত কামানো মুখে চোরা হিংস্রতার ঝিলিক।

গুঁফো লোকটি সহসা দাঁত ছড়িয়ে বলে উঠল, "কী খুকি, এখনও ঘুমোওনি যে?"

গলাটা মোটেও বাজখাঁই নয়, বরং যেন ভাঙা-ভাঙা, ফ্যাসফেসে। তবু তার স্বর শুনে বুকটা ধক করে উঠেছে টুপুরের। তাড়াতাড়ি সরে এল। সিটে ফিরে হাঁপাচ্ছে অল্প-অল্প। খানিক দম নিয়ে মিতিনকে বলল, "দু'টো অদ্ভুত লোক আছে কিন্তু কামরায়। আমাদের পাশের পাশের কুপটায়।"

"জানি," গলা অবধি কম্বলে ঢেকে শুয়ে ছিল মিতিন। চোখ বুজে। বোজা চোখেই বলল, "একজনের নাম কর্মবীর ঘোষ, অন্যজন শক্তিধর সমাদ্দার।"

"তুমি ওদের চেনো নাকি?"

"প্যাসেঞ্জার লিস্টে নাম দেখেছি।"

"দু'জনকেই বেশ সন্দেহজনক মনে হল।"

"কেন? রাতে পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে রুটি-তড়কা খেল বলে?"

"তুমি জানলে কী করে?"

"কিছুই তো দেখিস না। আমরা যখন রেলওয়ে ক্যান্টিনে বিরিয়ানি খাচ্ছিলাম, ওরা পিছনের টেবিলেই ছিল। দু'জনেই খুব খাইয়ে। দশটা বারোটা করে রুটি নিয়েছে।"

"ও। তবু, লোক দু'টো..."

"আর যাই হোক, তুই যা ভাবছিস তা নয়। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড় দেখি।"

মিতিনমাসির কথায় টুপুর খানিকটা আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে কই। মাঝে-মাঝেই টুকরোটাকরা আওয়াজ ভেসে আসছে গলার। একজন বোধ হয় উঠল সিট ছেড়ে, টুপুরদের কুপের সামনে দিয়ে জুতো মশমশিয়ে গেল দূরের বাথরুমটায়। কেন গেল ওদিকে? পুরো কামরা সরেজমিন করতে? যাক, ফিরছে লোকটা। আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে পড়ল? নাকি কোনও মতলব ভাঁজছে?

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়ল টুপুর। কত মাঠঘাট, কত নদনদী পেরিয়ে ছুটছে ট্রেন, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলছে ঝমঝমিয়ে, টুপুর তখনও গভীর নিদ্রায়।

নাহ, ডাকাতি লুঠতরাজ কিছুই হয়নি। টুপুরের ঘুম ভাঙল মিতিনমাসির ঠেলাঠেলিতে, "কী রে, ওঠ। মুখটুখ ধুয়ে নে। কটক তো এসে গেল, এবার নামতে হবে।"

ওমা, তাই তো! সকাল তো হয়ে গিয়েছে। টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠল। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দৌড়ল বেসিনে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে ফিরছে, তখনই ফের চমক। কর্মবীর আর শক্তিধর ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি।

ওরাও কটকে নামছেন?

হয়তো ওঁদের নামাটা স্রেফ কাকতালীয়। টুপুর জোরে-জোরে মাথা নাড়ল। তবু মনটা যেন কেন খচখচ করছে!

॥ ২ ॥

জঙ্গলের দোরগোড়ায় পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। টুপুররা কটকে নেমেছিল সকাল সাড়ে আটটায়। তারপর সাকুল্যে একশো কিলোমিটারও আসেনি, তবু যে কীভাবে চলে গেল গোটা দিনটা!

প্রথম সময় নষ্ট হল গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে। কটকের বাদামবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে বেশ কয়েকখানা জিপ দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোনওটাই পার্থমেসোর পছন্দ হয় না। চেহারা মনোমতো হলে দরে বনে না, দর ঠিক হলে চালককে দেখে নাক সিঁটকোয়। শেষমেশ যে গাড়িটাকে মনে ধরল তার চালকটির একমাত্র গুণ, তিনি ভাল বাংলা বলতে পারেন। পার্থমেসোর সাফ কথা, তিন-তিনটে দিন প্রায় অষ্টপ্রহর থাকব, তার সঙ্গে আমি সারাক্ষণ ওড়িয়া, হিন্দি চালাতে রাজি নই। বলব এক, সে বুঝবে আর-এক। এতে নাকি বেড়ানোর আনন্দই অর্ধেক মাটি হয়ে যায়।

যাই হোক, বিভূতি নামের সেই ড্রাইভারটিকে নিয়ে যাত্রা শুরু। কিন্তু এন এইচ ফাইভ ধরে তেরো কিলোমিটার গিয়ে এন এইচ বিয়াল্লিশে পড়ার পরই টের পাওয়া গেল, বিভূতিবাবু অত্যন্ত সাবধানি চালক। বাহনের গতি তিনি তিরিশ কিলোমিটারের উপরে ওঠাতেই চান না। মসৃণ রাজপথ ধরে অমন টিকুর টিকুর করে চলা যে কী দুঃসহ! গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছে পার্থমেসোর সাম্প্রতিক নেশাটি। একটা দামি ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছে, সঙ্গে একগাদা টেলিলেন্স। চলতে-চলতে কোনও দৃশ্য চোখে লাগল তো ব্যস, ওমনি গাড়ি থামাও। নেমে ফোটো তুলছে তো তুলছেই। পথে পড়ল ঢেঙ্কানল, ছুটল রাজবাড়ির ফোটো নিতে। এই করতে-করতে গাড়ি যখন আঙুলের বনদফতরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দুপুর প্রায় শেষ। কলকাতা থেকেই বনবাংলোর বুকিং করে রেখেছিল মিতিনমাসি, তবু সরকারি দফতরে গিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে আনতে খানিকটা সময় তো খরচ হয়ই।

তবে মধ্যাহ্নভোজটি চটপটই সারা হয়েছিল আজ। খুবই সরল মেনু। আঙুলের এক পঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে তন্দুরি রুটি আর কষা মাংস। কিন্তু আহার সেরে আর-একটি অভিযানে নামতে হল যে পার্থমেসোকে! সাতকোশিয়ার জঙ্গলে নাকি খাওয়াদাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নেই, নিজেদের রেশন নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ফর্দ বানানোই ছিল পার্থমেসোর, ঘুরে-ঘুরে বাজার করতে লাগল আঙুলে। চাল, ডাল, নুন, ঘি, তেল, চা, চিনি, আলু, পটল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন, প্যাকেট-প্যাকেট মশলা, বিস্কুট, পাউরুটি, আটা, ময়দা, এমনকী কেজিখানেক বেসনও। সকাল-বিকেল বেগুনি, পেঁয়াজি খেতে হবে যে! জ্যান্ত মুরগি কেনারও ইচ্ছে ছিল, মিতিনমাসি আর টুপুরের প্রবল আপত্তিতে বাতিল হয়ে গেল প্ল্যানটা। অগত্যা ডিমই ভরসা। ড্রাইভার সমেত পাঁচজন মানুষের জন্য পার্থমেসো প্রায় শ'খানেক ডিম কিনে ফেলল। ওমলেট খাবে, পোচ খাবে, ডালনা হবে, ডিমের খিচুড়ি হবে। কত কী যে তার ইচ্ছে। বিভূতিবাবু আগাগোড়াই ভাবলেশহীন ছিলেন, তিনি পর্যন্ত পার্থমেসোর ভোজনের পরিকল্পনা শুনে হাসছেন খুকখুক।

এভাবেই এগোতে-এগোতে টুপুররা অবশেষে পৌঁছেছে পম্পাসারে। এখান থেকেই সাতকোশিয়া জঙ্গলের শুরু। রয়েছে বনবিভাগের চেকপোস্ট, সেখানে জাবেদা খাতায় যাত্রীদের নাম, ঠিকানা, গাড়ির নম্বর, সব লেখার পর জঙ্গলে ঘোরার অনুমতি মেলে।

লেখালিখির কাজটা মিতিনমাসিই সারছিল। টুপুর আর বুমবুম ঘুরে-ঘুরে দেখছিল চারদিকটা। এখনও তেমন একটা জঙ্গল-জঙ্গল ভাব আসেনি। তবে সামনেই যে গভীর অরণ্য, এখানেই যেন তার আভাস মিলছে অল্প-অল্প। চতুর্দিক বেশ নির্জন, পাখির কিচিরমিচির ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বসন্তের গাছগাছালি লালে লাল হয়ে আছে ফুলে-ফুলে। একটা বুনো গন্ধও আসছে যেন।

হঠাৎই টুপুরের চোখ গিয়েছে চেকপোস্টে টাঙানো সাইনবোর্ডটায়। জ্বলজ্বল করছে জঙ্গলের নাম, 'সাতকোশিয়া গর্জ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি'।

নিজের মনে টুপুর অস্ফুটে বলল, "স্যাংচুয়ারি মানে তো অভয়ারণ্য। কিন্তু গর্জ ব্যাপারটা কী?"

বুমবুম বিজ্ঞের মতো বলল, "এখানে বাঘের গর্জন শোনা যায় তো, তাই নাম হয়েছে গর্জ।"

ক্যামেরা কাঁধে পার্থ শাটার টিপছিল এলোমেলো। ছেলের জবাব শুনে হা হা হেসে উঠেছে, "বেড়ে বলেছিস তো! তোর হেডে মনে হচ্ছে ব্রেন আছে!"

টুপুর সন্দিগ্ধ চোখে বলল, "গর্জন থেকে গর্জ?"

"আরে, না রে না। গর্জ তো ইংরিজি শব্দ, মানে গিরিখাত।"

"ওড়িশার জঙ্গলে আবার গিরিখাত আসে কোত্থেকে?"

"উঁহু, জঙ্গলে গিরিখাত নয়। গিরিখাতে জঙ্গল।"

"মানে?"

"আমরা এখন আর সমতলে নেই। প্রায় হাজার ফিট উঠে এসেছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতে আরও খানিকটা ওঠানামা হবে। এটা পূর্বঘাট পর্বতমালার একটা অংশ। সেই পূর্বঘাটেরই কয়েকটা পাহাড়ের মধ্যে গিরিখাতে গড়ে উঠেছে এই জঙ্গলটা। ম্যাপ যা বলছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে মহানদী।"

বিভূতি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পার্থর বর্ণনা শুনছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে সাত ক্রোশ পথ গিয়েছে মহানদী। মানে, চোদ্দো মাইল। আর ওই সাত ক্রোশ থেকেই জঙ্গলের নাম সাতকোশিয়া।"

পার্থ ঘাড় নাড়ছে। জিজ্ঞেস করল, "এখানে নাকি আগে তিনখানা জঙ্গল ছিল?"

"সে তো মহানদীর এপার-ওপার মিলিয়ে। এখন সবক'টা একসঙ্গে নিয়ে সাতকোশিয়া। তবে এপারের জঙ্গলটি বেশি ঘন। জন্তুজানোয়ারও এপারেই বেশি।"

"দেখা যায় কাউকে? নাকি সবাই জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকে?"

"কপালে থাকলে চোখে পড়বে স্যার। হরিণ তো পাবেনই, বাইসনও মিলতে পারে। এখন তো মহুয়াফুল ফোটার সময়। ভল্লুক মহুয়া খেতে খুব ভালবাসে, তাই তাদেরও হয়তো দেখা পেতে পারেন।"

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "আর বাঘ? হাতি?"

"ওরা একটু দূরে-দূরে থাকাই ভাল, বুঝলে খোকা। বিশেষ করে হাতি।"

"কেন? হাতি তো খুব ভাল। লোকে তো হাতির পিঠে চড়ে।"

"জঙ্গলের হাতি মোটেই সেরকম শান্তশিষ্ট নয়, খুব রাগী। সামনে পড়লে খেপে গিয়ে আস্ত আমাদের জিপগাড়িখানা উলটে দিতে পারে," বিভূতি চোখ ঘোরালেন, "তবে বাঘ এ জঙ্গলে বেশি নেই। যা আছে বেশিরভাগই চিতা। তারাও বড় মারাত্মক। কাউকে যদি জঙ্গলে একা পেয়ে যায়, বিশেষ করে বাচ্চাদের..."

বুমবুমের মুখ শুকিয়ে আমসি। ছেলের ভাবান্তর নজরে পড়েছে পার্থর। এগিয়ে এসে হাত রাখল ছেলের মাথায়, "আহা, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বনজঙ্গলে তুই একা-একা ঘুরবি নাকি? আমরা তো থাকব সঙ্গে।"

অমনি বুমবুমের মুখে হাসি ফিরেছে। সগর্বে বলল, "আমি ভয় পাইনি তো। লেপার্ড এলে আমি ঢিল মেরে তাড়িয়ে দেব।"

"বটে? চল তো ভিতরে, দেখব তোর কত সাহস। ঘরে বসে একবার বাঘের ডাক শুনলেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে।"

শুনেই বুমবুমের মুখ ফের কাঁচুমাচু। বিভূতি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "না গো খোকা। তোমরা যেখানে থাকবে, মানে টিকরপাড়া বনবাংলোয়, ওদিকটায় বাঘ, চিতাবাঘ আসে না বড় একটা। লবঙ্গির

জঙ্গলেই ওদের বেশি উপদ্রব। আর টুলকায়।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "সেগুলো আবার কোথায়?"

"সাতকোশিয়ার ভিতরেই।"

"আমরা সেখানে যাব না?"

"নিশ্চয়ই যাব," পার্থ বলল, "বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। উনি আমাদের গোটা জঙ্গলটাই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাবেন। এই ফরেস্ট তো আপনার হাতের তালুর মতো চেনা। তাই না বিভূতিবাবু?"

"হ্যাঁ স্যার, পুরোটাই আমার নখদর্পণে। প্রতি বছরই পাঁচ-ছ'বার করে আসি কিনা। এই তো পরশু দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এক কলেজের মাস্টারমশাই, আর তাঁর ছাত্র। সাতদিন পর ফিরবেন। কথা হয়েছে, ফোন করে ডাকলে আমি এসে নিয়ে যাব।"

"জঙ্গলে ওঁরা গাড়ি ছাড়াই ঘুরবেন?"

"অনেকেই ওরকম ঘোরে স্যার। অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তা হলে টিকরপাড়ায় আমরা কী দেখতে পাব? শুধুই কুমির? মানে ঘড়িয়াল?"

"হ্যাঁগো দিদিভাই। ঘড়িয়াল তো ওখানে কিলবিল করছে। নদীতে, পাশের খাঁচায়," রোগাসোগা খাটো চেহারা বিভূতির মুখে চিলতে হাসি দেখা গেল। কাঁচাপাকা গোঁফে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, "মাঝে-মাঝে ভারী বিপদ ঘটায় ঘড়িয়ালগুলো। বনবাংলোর বারান্দায় পর্যন্ত চলে আসে। দরজায় ঠকঠক করে।"

দৃশ্যটা মোটেই মজার বলে মনে হল না টুপুরের। ঘরের সামনে কুমির ঘুরে বেড়াবে, এ কেমন জঙ্গল রে বাবা? মাছ খায় বলে মানুষের হাত-পা চেখে দেখবে না, এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।

টুপুরের বুকে একটা হালকা কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, তখনই মিতিন ফিরেছে। কাগজপত্র ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, "চল চল, বাংলোয় ঢুকতে সন্ধে না হয়ে যায়।"

ঝটিতি জিপে উঠে যে যার সিটে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছেন বিভূতি। সরু পিচের রাস্তা ধরে চলেছেন নিজস্ব গতিতে। শেষ বিকেলের রোদ্দুর মেখে শাল-সেগুনের জঙ্গল ভারী মায়াবি এখন।

বাইরেটা দেখতে-দেখতে মিতিন পার্থকে বলল, "তোমার ক্যামেরার ডিটেলটাও চেকপোস্টে এন্ট্রি করাতে হল। ভিডিয়ো না স্টিল, তাও নোট ডাউন করল।"

"তাই নাকি?" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "দারুণ কড়াকড়ি তো!"

"ছাই কড়াকড়ি," স্টিয়ারিং থেকে বিভূতি বলে উঠলেন, "একে বলে বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো।"

"কেন? কেন?"

"সাধারণ টুরিস্টের উপর খুব নিয়মকানুন ফলায়। ওদিকে চোরা শিকারিরা গার্ডদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি নিজেদের কাজ হাসিল করে যাচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই তো গত বছরেই দু'-দু'টো চিতাবাঘ মারা পড়ল। তিনটে হরিণও।"

"খবরটা পড়েছি," মিতিন মাথা নাড়ল, "চামড়া ছাড়িয়ে বডিগুলো ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। মোটামুটি এই সময়েই ঘটেছিল, তাই না? কেউ বোধ হয় ধরাও পড়েনি?"

"আপনি তো অনেক খবর রাখেন ম্যাডাম," বিভূতির স্বরে তারিফ। আপনমনেই বললেন, "সত্যি, তখন কত হইহল্লা হল। পুলিশের বড়- বড় অফিসার এসে কী হয়রানিই না করল টুরিস্টদের। কিন্তু পাজিগুলোর টিকিও ছুঁতে পারল না। ওড়িশার পুলিশ একেবারে অপদার্থ।"

"সব রাজ্যের পুলিশই প্রায় সমান বিভূতিবাবু," পার্থর গলায় পলকা ব্যঙ্গ, "এই তো, দু'-তিন সপ্তাহ আগেই দেখলাম আমাদের সুন্দরবনের চোরাশিকারিরা ঢুকে একটা বাঘ মেরেছে এবং চামড়াটি ছাড়িয়ে ভাগলবা। বন দফতর, পুলিশ কেউ কিছু করতে পারল?"

টুপুর করুণ মুখে বলল, "ওই সব লোক কী খারাপ! জন্তুজানোয়ার মেরে তাদের ছাল ছাড়িয়ে নেয়।"

"টাকার জন্য মানুষ কী না করে! একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার দাম তো কম নয়।" পার্থ সামনের সিট থেকে মিতিনের দিকে ঘুরে তাকাল, "মিনিমাম তিন-চার লাখ, কী বলো?"

"জানি না। গবেষণায় আমার স্পৃহাও নেই," মিতিন অল্প হাসল। "তবে তোমায় একটা অন্য খবর দিতে পারি। জঙ্গল টুরে নিউজটা বোধ হয় আমাদের কাজে লাগবে।"

"কী?"

"টিকরপাড়া ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারটি নাকি গতকাল সকাল থেকে হাওয়া। চেকপোস্টের গার্ডরা জানাল।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "তো? আমাদের তাতে কী এল গেল?"

"ওই চৌকিদারটিই টুরিস্টদের রান্নাবান্না করে দিত।"

"অ্যাঁ?" পার্থ এবার জোর ঝাঁকুনি খেয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ! আমাদের খাওয়াদাওয়ার কী হবে তা হলে?"

"এত তুমি ভোজনরসিক," মিতিন টুপুরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, "ক'দিন তুমিই না হয় আমাদের রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে।"

"সে তো আমি পারিই। কুকিং কী এমন কঠিন কাজ? তবে কিনা, বেড়াতে এসে ভেবেছিলাম ঘুরে-ঘুরে একটু ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি করব," বলতে-বলতে হঠাৎ কী ভেবে স্টিয়ারিংয়ের দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছে, "বিভূতিবাবু, আপনি রান্নাবান্না জানেন না?"

জঙ্গল হালকা হয়েছে খানিকটা। ছোট্ট একটা গ্রাম পেরোচ্ছে গাড়ি। ডান দিকে একটি স্কুল। সামনের মাঠে ফুটবল পেটাচ্ছে জনাকয়েক কিশোর। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে বিভূতি মৃদু স্বরে বললেন, "পারি স্যার। অল্পস্বল্প।"

"ভাতের ফ্যান গালতে পারেন?"

"হ্যাঁ।"

"রুটি সেঁকতে পারেন? লুচি, পরোটা ভাজা?"

"তাও পারি। তবে একটু তেড়াবেঁকা হয়।"

"নো প্রবলেম। পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপের মতো হলেও চলবে," পার্থকে বেশ খুশি-খুশি দেখাল, "ডাল, ভাজা, ডিমের ডালনাও পারেন নিশ্চয়ই?"

"করেছি মাঝে-মাঝে। খুব ভাল না হলেও মুখে তোলা যাবে।"

"আর পকোড়াটকোড়া?"

"চেষ্টা করলে হয়তো, ওই বেসনে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দেওয়া তো?"

"ইয়েস। দ্যাটস অল উই নিড!" উচ্ছ্বাসে ইংরিজি বেরিয়ে গেল পার্থর। বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে বলল, "রান্নার দায়িত্বটা তা হলে আপনিই নিন। আমরাও থাকব, হেল্পটেল্প করব। সবাই মিলে ক'দিন ধরে বেশ একটা বনভোজন-বনভোজন চলবে। কী বিভূতিবাবু, রাজি তো?"

ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লেন বিভূতি। নীরব সম্মতিটুকু পেয়ে পার্থ আহ্লাদে আটখানা। ঘুরে টুপুরকে বলল, "তোর মাসি আমায় জব্দ করবে ভেবেছিল। কেমন একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম দ্যাখ। হা হা হা।"

বুমবুম খলখল হেসে উঠল কিছুই না বুঝে। টুপুরও হাসছে মিটিমিটি। গ্রাম ছাড়িয়ে আবার ছেঁড়া-ছেঁড়া জঙ্গলে ঢুকেছে গাড়ি। যেতে-যেতেই বাঁয়ে একখানা বনবাংলো 'পুরানাকোট ফরেস্ট রেস্ট হাউস'। কোনও লোকজন নেই, শুনশান পরিবেশে যেন ঝিমোচ্ছে বাংলোটা। তার একটু পরেই এসে গিয়েছে টিকরপাড়া।

পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি। একটায় বনবিভাগের অফিস কাম ফরেস্ট অফিসারদের ইনস্পেকশন বাংলো। মন্ত্রীসান্ত্রিরাও এসে থাকেন সেখানে। অন্য দু'টো বাংলো সাধারণ ভ্রমণার্থীদের জন্যে। বাংলোর সামনে একটা বড়সড় লন। সেখানে গাড়ি থামতেই বনবিভাগের কর্মচারী হাজির। টুপুরদের বুকিংয়ের কাগজপত্র তিনি

দেখলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর চাবি এনে খুলে দিলেন একটা দু' কামরাওয়ালা স্যুইট। ভিতরে বন্দোবস্ত মন্দ নয়। বড়-বড় খাট, আলমারি, সোফা, ড্রেসিংটেবিল সবই পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। ডাইনিংটেবিল পেতে খাওয়ার জায়গাও করা আছে একখানা। বাথরুম ঝকঝকে, শাওয়ারও মজুত। আরাম করে থাকতে গেলে এর বেশি আর কী-ই বা চাই!

ব্যাগ, সুটকেস ঢোকানো হয়েছে ঘরে। বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে পার্থ। হাঁক ছাড়ল, "টুপুর, বিভূতিবাবুকে বল তো, আমাদের খাওয়ার জিনিসপত্রগুলো যেন গাড়ি থেকে নামিয়ে নেন। আর এখন একটু চা হলে ভাল হয়।"

অমনি মিতিনের ধমক, "অ্যাই, নিজে ওঠো তো! বেচারা এতক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, তুমি গিয়ে বিভূতিবাবুর সঙ্গে হাত লাগাও। রান্নাঘরগুলো ওই দূরে, জিনিসপত্র নিজেই পৌঁছে দিয়ে এসো।"

অগত্যা সুখশয্যা ছাড়তেই হল পার্থকে। টুপুরও পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লনটায়। দিনের আলো প্রায় মরে এসেছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলকাকলিতে জঙ্গল এখন রীতিমতো মুখর। এত শব্দ যে, কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। তাদের বাংলোখানা পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে। অনেকটা নিচ থেকে ভেসে আসছে নদীর আওয়াজ। লন থেকে দেখা যাচ্ছে না নদীটাকে, তাই যেন ওই শব্দে কেমন গা ছমছম করে। খানিকটা দূরে, নদীর ওপারে আবার পাহাড়। সবুজে ছাওয়া। সূর্য বুঝি ওই পাহাড়ের আড়ালে ডুবেছে, ছায়া নেমেছে পাহাড়ে। নদীটাকেও এবার দূরে দেখতে পেল টুপুর। এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের পিছনে। এই ছায়া-ছায়া আলোয় দৃশ্যটা যে কী অপরূপ!

হঠাৎই পাশে বুমবুম। তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। সঙ্গে মিতিনমাসি। হাতে ইনফ্রারেড বাইনোকুলার। খাঁটি জার্মান যন্ত্র, রাতেও দূরের বস্তু দেখা যায় বেশ। একটু লালচে ভাবে, তবে মোটামুটি স্পষ্ট।

বাইনোকুলার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিল মিতিন। হঠাৎ টুপুরকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দূরে মাঠটায় ফোকাস কর। চেনা কিছু পাচ্ছিস?"

টুপুর চোখে লাগাল যন্ত্রটা। নদীর পারে একটা তাঁবু। তার সামনে দু'টো লোক হাত পা ছড়িয়ে শরীরচর্চা করছে।

টুপুরের হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠল। কী কাণ্ড, ট্রেনের সেই মুশকো লোক দু'টো না, কর্মবীর আর শক্তিধর?

॥ ৩ ॥

বাংলোর অদূরে একটা ব্যারাক মতো বাড়ি। টিনের চাল, টানা লম্বা দাওয়া। সেখানেই পর পর তিনখানা রান্নাঘর। গ্যাস, কেরোসিনের ব্যবস্থা নেই, জঙ্গলের শুকনো কাঠ স্তূপ করা আছে দাওয়ায়। ইচ্ছে মতো কাঠ নিয়ে যে যার রান্না সারো।

সেই কাজই চলছিল এখন। ধরানো হয়েছে কাঠের আঁচের উনুন, চলছে রাতের রান্নার প্রস্তুতি। রান্নাঘরের দিকটায় বিদ্যুৎ নেই, জ্বলছে বন দফতরের হ্যাজাক। যথেষ্ট চড়া আলো, কাজ করতে কোনও অসুবিধে হয় না। বিভূতির উপর পুরো ভার ছেড়ে না দিয়ে মিতিন নিজেই নেমে পড়েছে রান্নাবান্নায়। টুপুর আর বিভূতি তাকে সাহায্য করছে হাতে-হাতে। পথশ্রমে আজ ক্লান্ত সবাই, তাই আর রুটিটুটির হাঙ্গামা নয়, সোজা ভাত বসিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে অল্পস্বল্প কিছু ভাজাভুজি আর ডিমের ডালনা, ব্যস।

রান্নাঘরগুলোর পাশে-পাশে ছোট-ছোট খুপরি। তারই একটায় মালপত্র জড়ো করে রেখেছিলেন বিভূতি। আছে বনবিভাগের বাসনকোসনও। তারই একটা ডেকচিতে চাল ধুচ্ছিল টুপুর কচলে-কচলে।

তখনই জিন্স, টিশার্ট পরা এক তরুণের আবির্ভাব। ফরসা রং, সুন্দর স্বাস্থ্য, মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। ভুরু কুঁচকে মিতিন, টুপুরকে সে দেখল একটু। তারপর বিভূতির দিকে চোখ পড়তেই তার ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বলল, "আরে বিভূতিবাবু, আপনি?"

"এই তো আজ আবার চলে এলাম এঁদের সঙ্গে," মিতিন আর টুপুরকে দেখালেন বিভূতি। স্মিত মুখে বললেন, "তা আপনাদের তো আরও ছ'-সাত দিন পরে ফেরার কথা, তাই না?"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "এঁরাই বুঝি পরশু আপনার সঙ্গে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ," বিভূতি মাথা নাড়লেন। যুবকটিকে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মাস্টারমশাই কোথায়?"

"স্যার বাংলোয়। সারাদিন জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি হয়েছে, এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।" বলেই মিতিনকে প্রশ্ন, "আপনারা বুঝি আমাদের পাশের বাংলোয় এলেন?"

"একদম ঠিক। এই খানিক আগে ঢুকেছি," মিতিন ভদ্রতা করে হাসল, "আমরা চারজন।

আমি প্রজ্ঞাপারমিতা, এই আমার বোনঝি ঐন্দ্রিলা, আমার বর আর ছেলে ঘরে। কী করছে তা অবশ্য জানি না।"

মিতিনের কথা বলার সহজ ভঙ্গিতে যুবকটি হেসে ফেলেছে। হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি সুবাহু চৌধুরী। আমার স্যার ইন্দ্রজিৎ সেনের লেজুড় হয়ে এসে পড়েছি এই সাতকোশিয়ায়।"

"এখন, এখানে আগমন নিশ্চয়ই রান্নাবান্নার জন্যে?"

"উপায় কী বলুন! রাতে তো কিছু পেটে দিতে হবে।" সুবাহুর মুখে সামান্য লজ্জা-লজ্জা ভাব, "কী যে ঝকমারিতে পড়েছি। এখানে আসার পরদিন থেকে চৌকিদারটি গায়েব। অগত্যা সেলফহেল্পের পালা চলছে। সকালে ভাতের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ আর রাতে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ ভাত। এই এখন আমাদের দু' বেলার মেনু।"

"খুব কষ্টে দিন কাটছে তা হলে?" মিতিনের যেন একটু মায়া হয়েছে। বলল, "এক কাজ করুন না, আমি ডিমের ডালনা বানাচ্ছি। আজ রাত্তিরটা আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিন।"

সুবাহু যেন হাতে চাঁদ পেল। খুশি-খুশি মুখে বলল, "তা হলে তো খুব ভালই হয়। কিন্তু আপনি বেড়াতে এসে আমাদের জন্যেও পরিশ্রম করবেন?"

"আরে দুর। পাঁচজনের রান্না, সাতজনের রান্নায় খাটুনির হেরফের হয় নাকি?" বলেই মিতিন নির্দেশ ছুড়েছে বিভূতিকে, "আরও কয়েকটা ডিম, আলু এনে সেদ্ধয় ফেলে দিন তো। ওটা হলে ভাত চাপিয়ে দিয়ে বেসন গুলে ফেলুন। বেগুনিটাও আমি ভাজব।"

টুপুর ফুট কাটল, "আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"থাক। সেদ্ধ ডিম, আলুর খোসা ছাড়িয়ে দে, তা হলেও যথেষ্ট।" মিতিন পেঁয়াজ, রসুন, আদা একসঙ্গে থেঁতো করতে-করতে বলল, "তা ভাই সুবাহু, হঠাৎ চৌকিদারটি পালাল কেন?"

"কী জানি। সাত দিন রেঁধে দেওয়ার জন্যে পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম। সেটা নিয়েই তো চৌপাট।"

"মাত্র পাঁচশো টাকা চোট করে আজকাল কি কেউ পালায়? নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। স্থানীয় বিট অফিস কী বলছে?"

"তারা নাকি কিছুই জানে না। ছুটিফুটিরও কোনও দরখাস্ত দিয়ে যায়নি।"

"অর্থাৎ ছুটি নেয়নি। স্ট্রেঞ্জ তো!"

টুপুর বলে উঠল, "হয়তো বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবরটবর এসেছিল। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ..."

"হতে পারে," সুবাহু কাঁধ ঝাঁকাল, "তবে বনদফতরের তো তেমন একটা গা দেখলাম না। আমারও ওকে নিয়ে অত ইন্টারেস্ট নেই। শুধু একটু অসুবিধেয় পড়ে গেলাম, এই যা। তবে ম্যানেজ তো করেই নিচ্ছি। সেদ্ধ খাচ্ছি, স্টকে পাউরুটিফাউরুটি আছে, তেমন দরকার পড়লে চলে যাব পুরানাকোট। সেখানে দোকান তো আছেই।"

"হুম," থেঁতো করা পেঁয়াজ, আদা, রসুন একটা বাটিতে রেখে মিতিন বলল, "কখন আবিষ্কার করলেন লোকটা নেই?"

"সেভাবে তো বলা কঠিন। সকালে চা দিল না, ব্রেকফাস্টও পাচ্ছিলাম না। 'রাজু-রাজু' করে কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম, সাড়া নেই। তারপর কোয়ার্টারে গিয়ে দেখলাম, তালা ঝুলছে।"

"অথচ তার আগের রাত্তিরেও তো সে..."

"দিব্যি ছিল। কী যে হয় এদের, কখন পাখা গজায়!" বলতে-বলতে ঘড়ি দেখল সুবাহু। একটু যেন ব্যস্ত মুখে বলল, "যাই, স্যারকে গিয়ে নেমন্তন্নর সুখবরটা দিই।"

"সেই ভাল। আমরা ততক্ষণ কাজকর্মগুলো সারি। রান্না হয়ে গেলে বিভূতিবাবু আপনাদের ডেকে আনবেন। আমাদের বাংলোতেই সবাই মিলে খাব একসঙ্গে।"

ঢুক করে ঘাড় নেড়ে চলে গেল সুবাহু। মিতিনরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নাবান্নায়। যখন যে কাজটা করে মিতিনমাসি, সে গোয়েন্দাগিরিই হোক বা ডিম রান্না, সমান মনোযোগে করে। দেখেছে টুপুর। হাতও চলে কী দ্রুত, বাব্বা! ঝটাঝট বেগুন কাটছে, কচাকচ লঙ্কা কুচোচ্ছে। টুপুর চারখানা ডিম ছাড়ানোর আগেই একডজন খোসা জড়ো করে ফেলল। শসা, টম্যাটোয় নুন, লেবু মাখিয়ে স্যালাডও রেডি হয়ে গেল একপ্লেট। তারই সঙ্গে অবিরাম টুকিটাকি নির্দেশও দিচ্ছে টুপুর আর বিভূতিবাবুকে।

মশলা কষিয়ে, কড়ায় ডিম আলু ছেড়ে একটু বুঝি ফুরসত মিলেছে মিতিনের। হাত ধুতে-ধুতে বিভূতিকে জিজ্ঞেস করল, "চৌকিদারটিকে তো আপনি চিনতেন, তাই না?"

"নিশ্চয়ই। এখানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে প্রায়ই আসা-যাওয়া করি, রাজুর সঙ্গে আলাপ না হয়ে পারে!"

"অল্পবয়সি ছেলে বুঝি?"

"একেবারেই ছোকরা। বয়স বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। ওর বাবা ভগীরথ ছিল এখানকার চৌকিদার। হঠাৎ ক'বছর আগে খারাপ ম্যালেরিয়ায় সে মরে গেল, তার জায়গায় চাকরি পেয়েছিল ছেলে।"

"রাজু এমনিতে কেমন, বেশ চটপটে? বুদ্ধিমান?"

"বুদ্ধি কতটা আছে জানি না, তবে খুব ছটফটে। সাহসীও বটে। রাতবিরেতে নাকি একা-একাই জঙ্গলে চরে বেড়াত।"

"ওর কোয়ার্টারটা কোথায়?"

"ওই তো, আপনাদের বাংলো দু'টোর পিছনেই।"

মিতিন আর কিছু বলল না। ডিমের ঝোলে গরম মশলা দিয়ে নাড়ল একটু, তারপর ঢালল গামলায়। বেশি টম্যাটোফম্যাটো দিয়ে খাসা রং বানিয়েছে। বেসনে কালো জিরে মিশিয়ে বেগুনি ভাজাও শেষ। ভাতের দায়িত্বটা বিভূতির উপর ছেড়ে বলল, "এবার এটা আপনি দেখুন, আমি বাংলোয় ফিরি।"

বিভূতি বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম, খুব ধকল গেল আপনার, ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিন।"

"খাবারদাবার, থালা, গ্লাসগুলো কি আমরা এসে নিয়ে যাব?"

"না, না। ছি, ছি। আমি সব পৌঁছে দেব।"

"তখন তা হলে আমার অতিথিদেরও ডেকে দেবেন প্লিজ।"

"সে কি আপনাকে বলতে হবে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিভূতিবাবুর গলা শুনেই বোঝা যায়, তিনি যথেষ্ট বিগলিত। না হয়ে বোধ হয় উপায়ও নেই। একদিকে মিতিনমাসির কর্মকুশলতা, অন্য দিকে সুন্দর ব্যবহার। বিভূতিবাবুর মতো একজন সাধারণ মানুষকে তো বশ করবেই। টুপুরের ভাবতে অবাক লাগে, হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করলে মিতিনমাসির এই ঠান্ডা-ঠান্ডা, গিন্নি-গিন্নি ভাবটা যে কী আমূল বদলে যায়!

জঙ্গলে অন্ধকার বেশ গাঢ় এখন। কৃষ্ণপক্ষের রাত, আকাশে এখনও চাঁদ ওঠেনি। ফটফট করছে তারা। সারাদিন যথেষ্ট তাপ ছিল আজ, এখন একটা নরম হাওয়া বইছে। অনেকটা নীচে নদীর আওয়াজ যেন আরও বেশি প্রকট। ওই শব্দ, স্নিগ্ধ বাতাস আর আলো-আঁধার, মিলেমিশে পরিবেশটাই কেমন অলৌকিক।

লন মাড়িয়ে বাংলোয় এসে টুপুর হাঁ। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার পাশে পার্থমেসো কানে ইয়ারফোন গুঁজে নিমীলিত চোখে মাথা দোলাচ্ছে।

হতবাক মুখে টুপুর বলল, "এ কী গো? আমরা ওদিকে খেটে-খেটে মরছি আর তুমি মজাসে মোবাইলে গান শুনছ?"

গলা পেয়ে ঝটিতি ইয়ারফোন খুলেছে পার্থ। ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমিও কাজ করছিলাম রে!"

মিতিন মুখ বেঁকিয়ে বলল, "দেখেছি, বিট অফিসারের সঙ্গে আড্ডা মারছিলে।"

"একেই বলে টিকটিকির নজর। রাঁধতে-রাঁধতেও চোখ ঘোরে।"

"কী করি বলো, যে পেশার যা অভ্যেস!" ঠাট্টাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলল মিতিন। জিজ্ঞেস করল, "তা কী-কী ইনফরমেশন বাগালে?"

"অনেক কিছু, অনেক কিছু," পার্থ টানটান। উত্তেজিত মুখে বলল, "জানো তো, এখানে নৌকোয় বোটিং করা যায়।"

"বোটিং তো লোকে নৌকোতেই করে। নয় কি?"

"টিজ কোরো না। কাল ভাবছি একটা বোটিং ট্রিপ নেব। তারপর দুপুরে লবঙ্গি। ওখানে নাকি একটা হাতির পাল ঘুরঘুর করছে। গেলে দর্শন মেলা নিশ্চিত।"

"হ্যাঁ, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তারা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"ওফ, এত কমেন্ট করো কেন? এখানে নাকি একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। জঙ্গলের একদম মধ্যিখানে। দিনের বেলা সেখানে খুব একটা থ্রিল নেই। বড়জোর হরিণটরিন চোখে পড়ে। কিন্তু একটু বেশি রাত্তিরে যদি যাওয়া যায়..."

"ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বাঘ এসে তোমার সঙ্গে কানামাছি খেলবে, তাই তো?"

"ফের বিদ্রূপ? আরে, আমাদের চার ব্যাটারির টর্চ আছে না? ওটা জ্বাললে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। সে দেখা যাবে'খন। কালকের ভাবনা কালকে। চৌকিদারের খোঁজ মিলেছে? বিট অফিসার কিছু বললেন?"

"উনি পাত্তাই দিলেন না। ছেলেটা নাকি উড়ুউড়ু টাইপ। মাঝে-মাঝেই দু'-দশ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। ফিরেও আসে। তবে কাজের ছেলে বলে চাকরিটা খোয়া যায় না। এখানকার ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্রটা তো ও-ই দেখাশোনা করে। খাঁচাটাচাগুলো পরিষ্কার রাখা তো সহজ কাজ নয়। সকলে ভিতরে যেতে সাহস পায় না।"

"ও!" ভুরু কুঁচকে মিতিন দু'-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন। তারপর সহজ স্বরে বলল, "তা এবারে একটু গা ঝাড়া দাও। একটা অন্তত দায়িত্ব নাও।"

"কী?"

"বুমবুমকে জাগিয়ে তুলে খাওয়াও।"

শুনেই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে পার্থর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে বুমবুমকে তোলা যে কী কঠিন! টানাহেঁচড়া করে তাকে উঠিয়ে বসালেও পরক্ষণেই সে ফের কাত। ফের লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। অতি কষ্টে তাকে খাড়া করা হল, অমনি সে কান্না জুড়েছে। পার্থ ছুটল তার খাবার আনতে। ভাত, আলু, ডিম চটকে ঝপাঝপ গরাস তোলা হচ্ছে মুখে, চোখ বুজেই গিলছে বুমবুম। কোনও মতে পাত খালি করে আবার সে ঢলে পড়ল ঘুমে।

ইতিমধ্যে টুপুরদের নৈশাহারের ব্যবস্থাও সারা। সব কিছু পরিপাটি ভাবে গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বিভূতি। টুপুর টেবিলে প্লেট সাজাচ্ছে, সুবাহুও তার মাস্টারমশাইকে নিয়ে উপস্থিত।

ইন্দ্রজিতের চেহারাটি বেশ দশাসই। গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু মাথার চুল ধবধবে সাদা। গাল জুড়ে শুভ্র দাড়ি ঝকঝক করছে আলোয়। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষটাকে প্রথম দর্শনেই বেশ ওজনদার পণ্ডিত বলে মনে হয়।

নেমন্তন্নর কথা জানতেন না বলে পার্থ বেশ অবাক হয়েছিল প্রথমটায়। তারপর সামলে নিয়ে দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেলল সুবাহু আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে। কথায়-কথায় জানা গেল, পরিবেশবিদ্যা নিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করছেন ইন্দ্রজিৎ। সুবাহু তাঁর ছাত্র এবং সহকারী।

খেতে বসে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "তা প্রোফেসরসাহেব কি এখানে গবেষণার কাজেই এসেছেন, নাকি নিছক ভ্রমণে?"

ইন্দ্রজিৎ গমগমে গলায় বললেন, "এক ঢিলে দুই পাখি মারছি বলতে পারেন। রেনফরেস্ট নিয়ে কাজ করছি, সাতকোশিয়া দেখারও খুব ইচ্ছে ছিল। ভারতের বৃহত্তম গিরিখাত বলে কথা!"

পার্থ বলল, "তাই বুঝি? এটা তো জানতাম না!"

"অনেকেই জানে না। একমাত্র উত্তর আমেরিকার কলোরাডোতেই এর চেয়ে বড় গিরিখাত আছে। তাও সেটা মোটেই সবুজ নয়। একেবারে ন্যাড়া। এমন ঘন জঙ্গল আর পাওয়া যাবে কোথায়!"

"আপনি বুঝি অনেক দেশ ঘুরেছেন?"

"ওই আর কী! কাজের সূত্রে এ মহাদেশ, ও মহাদেশ তো ঘুরে বেড়াতেই হয়। তবে আমাদের ভারতই সবার সেরা। এত বৈচিত্র আর কোথাও নেই।"

শুনে বেশ লাগল টুপুরের। বিদেশ ঘুরে আসা মানুষরা এ দেশের শুধু নিন্দেই করেন। ইন্দ্রজিৎ সেন তো ভারী অন্যরকম।

কৌতূহলী মুখে টুপুর প্রশ্ন করল, "তা সাতকোশিয়ায় এখনও পর্যন্ত আপনি কী-কী দেখলেন স্যার?"

"জন্তুজানোয়ার? একটা চিতল হরিণ আর খান পাঁচেক বুনো শূকর," ইন্দ্রজিৎ মৃদু হাসলেন, "তবে আমি জন্তু দেখতে আসিনি। আমার ইন্টারেস্ট পাহাড়। ছোটনাগপুরের মালভূমি কীভাবে এসে পূর্বঘাটে মিশছে, সেটাই দেখতে চাই। প্লাস, এখানকার গাছপালা স্টাডি করব। পাখিও।"

"এখানে অনেকরকম পাখি আছে বুঝি?"

"ভ্যারাইটির এখানে শেষ নেই, বুঝলে। পাখি আছে এখানে একশো আঠাশ প্রজাতির। গাছ আছে একশো ছাব্বিশ টাইপের। আটানব্বই রকমের গুল্ম। একান্ন ধরনের লতা। এ ছাড়া ওষধি গাছ আছে একশো পঁচিশ রকমের। সামনে যে নদীটা রয়েছে, তাতে তো প্রায় দু'শো রকমের মাছ আছে, জানো?"

পার্থ ঝুপ করে জিজ্ঞেস করল, "সেই জন্যই কি এখানে ঘড়িয়াল প্রকল্প? যাতে ওরা প্রাণ ভরে মাছ খেতে পারে?"

"বোধ হয়। তবে ওই সব সরীসৃপে আমার আগ্রহ নেই। তার চেয়ে প্রজাপতি দেখে বেড়াতে আমার বেশি ভাল লাগে।"

গল্প করতে-করতে খাওয়া শেষ। নৈশভোজের জন্য ইন্দ্রজিৎ বারবার ধন্যবাদ দিলেন মিতিনকে। পার্থ চোয়াল এঁটো করা হাসি উপহার দিল অধ্যাপককে। কাল কোথায়-কোথায় ঘুরবে পার্থরা জেনে নিয়ে বিদায় নিলেন গুরু-শিষ্য।

ওঁরা চোখের আড়াল হতেই পার্থর অন্য মূর্তি, "তোমার আক্কেলটা কী?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"হিসেব করে ডিম এনেছি। ওঁদের দু'খানা করে খাওয়ালে। শেষ দিকে যদি কম পড়ে যায়?"

"তখন ঘড়িয়ালের ডিম এনে দেব। এখনই তো ওদের ডিম পাড়ার সময়," মিতিন হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল, "বিশাল বড়-বড় সাইজ। কুমিরকুলে এদের ডিমই সব চেয়ে প্রকাণ্ড। এক-একখানার ওজন দেড়শো গ্রামেরও বেশি। ভাবতে পার? নদীর পারেই পেয়ে যাবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।"

"থাক, ওই খেয়ে মরি আর কী," বলে বেজার মুখে সরে গেল পার্থ। শুয়ে পড়েছে বুমবুমের পাশে। মশারির ভিতরে। টুপুরেরও আর শরীর চলছিল না, সেও শয্যা নিয়েছে পাশের ঘরে। জঙ্গলে মশারি টাঙানোর মতো জরুরি ব্যাপারটাও খেয়াল নেই।

ভাল মতোই তন্দ্রা এসে গিয়েছিল টুপুরের। হঠাৎই মৃদু ধাক্কা। মিতিনমাসির গলা পেল টুপুর, "কিছু শুনতে পাচ্ছিস?"

কান পাতল টুপুর। অস্ফুটে বলল, "একটা ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। রাতচরা পাখির ডাক বুঝি?"

"উঁহু, ওটা নয়। একটু ভাল করে শোন।"

"হ্যাঁ, তাই তো। একটা গিটার বাজছে যেন! ইংরিজি গানের সুর।"

"হুঁ, মনে হচ্ছে পাশের বাংলোয়।"

নির্ঘাত সুবাহু। টুপুর একটু মজাই পেল। আজব পড়শি জুটেছে তো, মাঝরাতে গিটার বাজায়!

॥ ৪ ॥

চার ভাগে ভাগ করে মোটা জালের খাঁচার ভিতরে ঝিম মেরে পড়ে আছে ঘড়িয়ালগুলো। কোনওটায় এক দেড় ফুটিয়া বাচ্চা, কোনওটা মাঝারি, কোনওটায় বা বেশ বড়সড়। দু'খানা তো রীতিমত প্রকাণ্ড। লেজ সমেত হাত পাঁচেকের কম নয়। খাঁচায় ছোট-বড় জলাধারও আছে বেশ কয়েকখানা। সিমেন্ট বাঁধানো। নানারকম মাছ

ছাড়া আছে জলাধারে। ঘড়িয়ালদের আহারের তোফা বন্দোবস্ত।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় আগে ঘড়িয়াল দেখেছে টুপুর। বুমবুমের জীবনে ঘড়িয়াল দর্শন এই প্রথম। সকালবেলায় এমন একটি জীবকে দেখে সে ভারী উত্তেজিত। বড় ঘড়িয়াল দু'টোর নট নড়ন চড়ন ভাব তাকে যেন বেশ ধন্দে ফেলেছে। ফিসফিস করে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "আই দিদি, ওরা জ্যান্ত না মরা?"

টুপুর বিজ্ঞের মতো বলল, "দুর বোকা, মরবে কেন! ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। হয়তো ঘুমোচ্ছে।"

"যাহ, চোখ তো খোলা!"

"কুমিরঘড়িয়াল চোখ খোলা রেখেই ঘুমোয়।"

"ধারণাটা পুরো ঠিক নয় রে টুপুর।"

ভাই-বোনের কথার মাঝে নাক গলিয়েছে পার্থ। বলল, "কুমিরঘড়িয়ালের আমাদের মতো চোখের পাতা নেই। আছে মণির উপর পাতলা আঁশের মতো একটা স্বচ্ছ আস্তরণ। অতএব ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে বোঝা অসম্ভব।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "মাছদের মতো?"

"অনেকটা সেরকম," পার্থ মাথা দোলাল, "ভাল করে লক্ষ কর টুপুর। কুমির পরিবারের মধ্যে ঘড়িয়াল কিন্তু ইউনিক। এক অদ্ভুত চিজ। দেহের তুলনায় মুখখানা কত সরু দেখেছিস তো? কতখানি লম্বা? পুরো লম্বাটে মুখখানা জুড়ে সার-সার দাঁত। আমাদের মতো বত্রিশ পাটি নয়, একশো দশখানা এবং ভয়ংকর ধারালো।"

বুমবুম বলল, "ওই দাঁত দিয়েই ওরা মাছ কুচিকুচি করে?"

"না রে, মাছ খেতে দাঁত ওদের কাজেই লাগে না। ওদের তো আমাদের মতো কষের দাঁত নেই, তাই চিবোতে পারে না। ওরা খপাত করে ধরে আর গপাত করে গেলে।"

"তা হলে দাঁতগুলো কী কাজে লাগে?"

"মেনলি চোয়াল দু'টো ধরে রাখার জন্য। নইলে তো মুখটা ল্যাতপ্যাত করবে। ঘড়িয়ালের বয়স হলে ওই দাঁতগুলো ক্রমশ ছোট আর মোটা হতে থাকে।"

মিতিন পালা করে একবার ছোট ঘড়িয়াল, একবার বড় ঘড়িয়ালগুলোকে নিরীক্ষণ করছিল। হালকা হেসে পার্থকে বলল, "তুমি যে ঘড়িয়াল এক্সপার্ট, তা তো জানা ছিল না।"

"গুণ আমার অনেক আছে ম্যাডাম। তুমিই যা পাত্তা দাও না।"

"তা গুণটা তোমার, না ইন্টারনেটবাবুর?"

পার্থ হেসে ফেলল, "সত্যি, ইন্টারনেট সার্চ করে-করে যে কত কিছু জানছি।"

"আর কী-কী শিক্ষা লাভ করেছ?"

"এই যেমন ধরো, এখনও পর্যন্ত যে বৃহত্তম ঘড়িয়ালটিকে পাওয়া গিয়েছে তার দৈর্ঘ্য তেইশ ফুট। সেটাকে উনিশশো চব্বিশ সালে উত্তর প্রদেশের কোশী নদীতে গুলি করে মারা হয়েছিল। তার পরেরটি ছিল জলপাইগুড়ির চেকো নদীতে। তিনিও উনিশশো চব্বিশ সালে মানুষের গুলিতে অক্কা পান। একসময়ে এই ঘড়িয়াল আমাদের উপমহাদেশের নদীতে-নদীতে গিজগিজ করত। সিন্ধু, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, কোথায় না ছিল! এখন চম্বল, শোন আর মহানদী, ব্যস। আর ছুটকোছাটকা কিছু আছে নেপালে। ষাট বছর আগে যাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, দু' হাজার হ'য়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'শো পঁয়ত্রিশে।"

"এত কমে গিয়েছে?" টুপুরের গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "কেন?"

"আমাদের দোষে। এত বেশি মাছ ধরছি, নদীনালা থেকে ওদের খাবার গিয়েছে কমে। ওদের ডিমগুলো পর্যন্ত লোকে উদরস্থ করছে। তা ছাড়া মেরে ফেলাফেলি তো চলছেই অনবরত। ওদের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে নানা ওষুধ তৈরি হয়। আর ওদের চামড়া তো ভীষণ-ভীষণ দামি। শুধু শৌখিন ব্যাগ জুতো আর বেল্টের চামড়া জোগাতে-জোগাতে কত ঘড়িয়াল যে ফুড়ুৎ হয়ে গেল!"

টুপুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের সুখ বিলাসিতার জোগান দিতে গিয়ে কত পশুপাখি যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে! কমে এসেছে বাঘ, লোপ পাচ্ছে গন্ডার। এরকম সংরক্ষণ কেন্দ্র না থাকলে ঘড়িয়ালও পৃথিবী থেকে না মুছে যায়!

পার্থ ক্যামেরা বের করেছে। একটা ছোট ঘড়িয়ালের দিকে তাক করতে-করতে বলল, "সব চেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস? আমরা কথায়-কথায় বলি, লোকটা কী ঘড়িয়াল রে বাবা! অর্থাৎ লোকটা মহা দুষ্টু। অথচ ঘড়িয়াল মোটেই তেমন চালাকচতুর নয়। একটু কায়দা করে মাছ ধরে বটে, কিন্তু বাস করে খোলা বালির উপর। পা চারখানা এতই দুর্বল যে, জোরে নড়াচড়াও করতে পারে না। তাই এদের পটাপট মেরে ফেলাটাও সহজ।"

টুপুর জিজ্ঞেস না করে পারল না, "তা হলে খামোখা এদের ঘড়িয়াল বলে কেন?"

"ঘড়িয়াল নামটা এসেছে ঘড়া থেকে। কলসি ঘড়া, সেই ঘড়া।"

"মানে? এদের তো মোটেই ঘড়ার মতো দেখতে নয়?"

"ভাল করে প্রাণীগুলোর দিকে তাকা। মুখের উপরের দিকটা কেমন শুঁড়ের মতো লম্বা না?"

"হ্যাঁ।"

"ওরই ডগায় একটা ফোলা মতন জায়গা দেখছিস?"

"আছে তো।"

"তার ঠিক নীচেই ওদের নাকের ফুটো। জোরে শ্বাস ফেললে ওই ফোলা জায়গাটা খুলে গিয়ে ঘড়ার আকার নেয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ ওরা ওই ঘড়ার সাহায্যে ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারে। সেই আওয়াজ কখনও-কখনও এতই প্রচণ্ড যে, এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায়। যাকে তুই বলতে পারিস ঘড়িয়ালের বৃংহণ।"

বুমবুম মন দিয়ে বাবার কথাগুলো গিলছিল। ভুরু কুঁচকে বলল, "তা এখন ওরা ডাকছে না কেন?"

"ইচ্ছে হচ্ছে না, তাই। ওরা তো সার্কাসের জোকার নয় যে, আমরা চাইলেই খেলা দেখাবে।"

"ওরা তো খাচ্ছেও না। হাঁ পর্যন্ত করছে না।"

"করবে, করবে। এত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? দেখবি, একবার হাঁ করলে মুখ আর বন্ধই হচ্ছে না। তখন দাঁতগুলো গুনে নিস, কেমন।"

বুমবুমের বুঝি প্রস্তাবটা তেমন মনে ধরল না। দৌড়ে চলে গিয়েছে মা'র কাছে। মিতিন প্রদক্ষিণ করছিল খাঁচাখানা, তার আঁচল ধরে হাঁটছে বুমবুম।

হঠাৎই পিছন থেকে একটা ডাক, "গুড মর্নিং। সকাল-সকালই আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন দেখছি!"

একসঙ্গে সবাই ঘুরে তাকিয়েছে। সুবাহু। পরনে কাল রাতের জিন্স-টিশার্ট। হাত দু'খানা পকেটে ঢুকিয়ে কায়দা মেরে দাঁড়িয়ে।

ফোটো তোলা থামিয়েছে পার্থ। হেসে বলল, "সাতকোশিয়ার পয়লা নম্বর দ্রষ্টব্যটিকেই চাখছি।"

"কেমন টেস্ট?"

"খুব একটা জুতসই নয়। ব্যাটারা একবারও মুখ খুলছে না।"

"ওই তো, ওই তো খুলছে।"

সত্যি তো! চোয়াল ক্রমশ ফাঁক হচ্ছে বড় ঘড়িয়াল দু'টোর। প্রায় একসঙ্গে! ঈষৎ বাঁকা ছোট-বড় দাঁতগুলো বিকশিত হচ্ছে ক্রমশ!

অমনি পার্থকে আর পায় কে! পলকে ক্যামেরা চালু। এদিক থেকে শাটার টিপছে, ওদিকে গিয়ে শাটার টিপছে। টুপুর আর বুমবুমের চোখেও মুগ্ধ বিস্ময়।

মিতিন হাসি-হাসি মুখে সুবাহুর সামনে এল, "আপনি একা যে, প্রোফেসরসাহেব কোথায়?"

"স্যার তৈরি হচ্ছেন। এবার বেরিয়ে পড়ব।"

"কোথায় যাবেন এখন?"

"ঠিক নেই, স্যার যেদিকে বলবেন। কয়েকটা রেয়ার টাইপের প্রজাপতি ট্রেস করেছেন স্যার। সম্ভবত ওগুলোরই সন্ধান চলবে আজ।"

"ও। কাল রাতে গিটার কে বাজাচ্ছিল, আপনি?"

"আপনারা শুনতে পেয়েছেন?"

"জঙ্গলের মধ্যে কানে না এসে পারে? তা ছাড়া পাশাপাশি বাংলো।"

"তা বটে," সুবাহু লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসল, "কাল একদম বসা হয়নি তো, তাই মাঝরাতে। আপনাদের ডিসটার্ব করিনি তো?"

"না না, গভীর রাতে বেশ লাগছিল। আপনার হাত তো খুব ভাল। পেশাদার শিল্পীদের মতো।"

"তেমন কিছু নয়। নিয়মিত চর্চাটা করি, এই যা।"

কথার মাঝে কখন যেন মুখ বন্ধ করে ফেলেছে দুই ঘড়িয়াল। এক তালে। বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "কই, ওরা তো কিছু খেল না?"

"ওদের যা খাওয়ার ঠিক খেয়ে নিয়েছে," পার্থ বলল, "খাঁচার পোকামাকড় সব এখন ওদের পেটে।"

পকেট থেকে হাত বের করে সুবাহু ঘড়ি দেখল, "এবার তবে আমি যাই? আপনারাও প্রাণ ভরে জঙ্গলে চক্কর মারুন।"

পার্থ বলল, "ভাবছি সকালের দিকে একটু নৌকোয় চড়ব।"

"পাবেন কী? একটাই তো নৌকো। সে কখন থাকে, কখন থাকে না।"

সুবাহু চলে গিয়েছে বাংলোর দিকে। টুপুররাও ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে এল। পায়ে-পায়ে পৌঁছল পাহাড়টার কিনারায়। সামনে পাথর কেটে-কেটে নেমে গিয়েছে সিঁড়ি, নীচে সেই মহানদী পর্যন্ত। পাহাড়ের কিনারা থেকে প্রায় শ'দেড়েক ফুট তো হবেই।

মিতিন টুপুরকে বলল, "কী রে, নামবি নাকি? যাবি নদীতে?"

ইচ্ছে তো করছে টুপুরের। আবার একটু-একটু ভয়ও লাগছে যে। মহানদী এখানে মোটেই তেমন সরু নয়। গর্জনেই মালুম হয়, স্রোতও আছে যথেষ্ট। একবার পা পিছলে পড়লে আর রক্ষে নেই।

টুপুর ঢোক গিলে বলল, "কী হবে গিয়ে?"

"মহানদীর জলে একটু চরণ ছুঁইয়ে আসি। এলেবেলে নদী তো নয়, আসছে সেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুর থেকে। কোনও এক হ্রদ থেকে যেন বেরিয়েছে।"

"হ্যাঁ, হ্রদটা ফরশিয়া গ্রামে। এই নদীতেই রয়েছে ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ।" পার্থ বুক ফুলিয়ে বলল, "বাঁধটার নাম নিশ্চয়ই সবাই জানো, হীরাকুঁদ।"

মিতিন মুখ টিপে বলল, "এটাও কি তোমার ইন্টারনেটের টিপস?"

"না ম্যাডাম, এটা জেনারেল নলেজ," বলে পার্থ ঝুঁকল সামান্য, বলল, "যাও, নদীতে ঘুরে এসো।"

"আর তুমি?"

"আমার এতটা নামা-ওঠার কোনও বাসনা নেই। আমি এখান থেকে ফোটো তুলব।"

মিতিন চটি খুলে তৈরি। দেখাদেখি টুপুরও। বুমবুম বাবার দলে, সে পার্থর হাত ধরেছে। তখনই বিট অফিসারের আগমন। বছর চল্লিশ বয়স, তেলচুকচুকে চেহারা, পরনে নীল প্যান্ট, সাদা বুশশার্ট।

পার্থ বলে উঠল, "গুড মর্নিং স্যার। কাল অত গল্প হল, অথচ আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি।"

"আমি পূর্ণচন্দ্র বেহেরা," ওড়িয়া ছাঁচের হিন্দিতে বললেন, বিট অফিসার। মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাডাম কি স্নানে নামছেন নাকি?"

"ভাবছি। নদীতে ডুব দিলে মন্দ হয় না, কী বলেন?"

"খুব সাবধান। জলে ঘষা খেয়ে পাথরগুলো বড় পিছল হয়ে থাকে কিনা," পূর্ণচন্দ্র একবার নদীর দিকে তাকিয়ে নিলেন, "ভুলেও কিন্তু সাঁতার কাটার চেষ্টা করবেন না। বিপদ ঘটতে পারে।"

"তাঁবুটা তো দেখছি নদীর পারে। ওই জায়গাটা বোধ হয় সেফ, না?"

"সামান্য ইতরবিশেষ আর কি। স্রোতটা কম, তবে ওদিকে ঘড়িয়ালের সংখ্যা বেশি।"

"আহা, ঘড়িয়াল তো মাছ খায়। মানুষ তো ধরে না।"

"সে তো ঠিকই। কিন্তু গায়ের কাছে চোদ্দো-পনেরো ফিট ঘড়িয়াল ঘুরে বেড়ালে জলে নেমে স্বস্তি পাবেন কি?"

"তা হলে ওখানে তাঁবু খাটিয়ে থেকে কী লাভ?"

"যার যেমনটা পছন্দ। ওখানে আমরা একটা নেচার স্টাডি ক্যাম্প খুলেছি। অনেকেই বাংলোর বদলে টেন্টে থাকাটাই প্রেফার করেন।"

পার্থ দুম করে বলল, "আমরা কেন তাঁবু নিলাম না মিতিন?"

"চেয়েছিলাম তো। আঙুলে বলল, এখন নাকি তাঁবুর অ্যাকোমোডেশন নেই।"

"ছিল না তো," পূর্ণচন্দ্র বললেন, "দিন পনেরো আগে একটা ঝড় হয়েছিল, তখন তাঁবুর ছত্রাকার দশা। তারপর থেকে আর দেওয়াই হচ্ছিল না। কাল দুপুরে হঠাৎ দুই ভদ্রলোক এসে হাজির। কাকে ধরেকরে যেন ম্যানেজ করেছেন। তাঁবু তো খাটানোই ছিল না, অফিস থেকে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই লাগিয়ে ফেললেন।"

"ওঁরা কারা? কিছু জানেন?"

"হবে কোনও কর্তাব্যক্তির জান পহেচান। নিজেরা নিজেদের মতো আছেন, এদিকে আসছেনও না," পূর্ণচন্দ্র একটা তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করলেন। পার্থকে বললেন, "ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। নৌকো চড়ায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, জলের তোড়ে বোট ডুবেও যায়। ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন তো, বুঝেশুনে চলবেন।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মনে থাকবে।"

হেলেদুলে অফিসের দিকে চলে গেলেন পূর্ণচন্দ্র। মিতিনদেরও আর নীচে নামা হল না। জলখাবার বানিয়ে বিভূতি ডাকাডাকি করছেন। ঘোরানো রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে-উঠতে টুপুরের নজরে পড়ল, জঙ্গল পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন ঝোলা পিঠে ইন্দ্রজিৎ। সুবাহু চলেছে পিছু-পিছু, কাঁধে গিটারের বাক্স। আজ জঙ্গলেই বাদ্যচর্চা করবে নাকি? হরিণ, বাইসনদের গিটার শোনাবে? দুনিয়ায় কত ধরনের পাগল যে থাকে! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেই প্রাতরাশ সেরে নিল টুপুররা। একটু তেড়াবেঁকা হলেও পরোটা বেশ ভালই বানিয়েছেন বিভূতি। লঙ্কা, পেঁয়াজ সহ আলুভাজাটাও মন্দ নয়। তার সঙ্গে কলা আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে সকলেরই পেট জয়ঢাক। কালই স্থির হয়েছে দিনের রান্নাটা বিভূতিই সারবেন, মিতিন হাতাখুন্তি ধরবে রাতে। দায়িত্ব পেয়ে বিভূতি দারুণ উৎসাহিত। নিজেই উদ্যোগী হয়ে ভোরবেলা কাকে যেন বলে এসেছেন, একটু পরেই এসে যাবে মাছ। মহানদীর। দুপুরে তাই ডিম নয়, ডাল, ভাজাভুজির সঙ্গে আজ মাছের ঝোলের আয়োজন।

এবার নৌকো চড়ার পালা। ঘাটটা বাংলো থেকে খানিক দূরে, তাঁবুর সামনেটায়। মোরাম বিছানো পথ ধরে গিয়ে নামা যায় নদীর দিকটায়। ফুরফুরে মেজাজে শিস দিতে-দিতে দলপতির মতো চলেছে পার্থ। বুমবুম ছুটছে লাফিয়ে-লাফিয়ে। তাকে আজ দুধ খেতে হয়নি, তাই যেন আহ্লাদে ডগবগ। টুপুর হাঁটছিল মিতিনের পাশে-পাশে, তার হাতে মাসির বাইনোকুলার।

তাঁবুর কাছাকাছি এসে ট্রেনের লোক দু'টোর সঙ্গে দেখা। ঝোলা পিঠে বেঁধে তাঁরাও বেরনোর জন্য প্রস্তুত।

তাগড়াই গোঁফ মানুষটি টুপুরকে দেখে বললেন, "তোমরাও এখানে? বাহ্, বাহ্। কখন এলে কাল?"

"প্রায় সন্ধের মুখে। আপনারা তো কাল দুপুরেই?"

"হ্যাঁ, কটকে নেমে আর দেরি করিনি। জিপ ভাড়া করে প্রায় তক্ষুনি।"

"খুব তাড়া ছিল বুঝি?"

"তা ছিল একটু। ওই বাংলোর সামনে কি তোমাদেরই গাড়ি?"

"হ্যাঁ।" এবার পার্থ জবাব দিল, "সঙ্গে গাড়ি থাকলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর সুবিধে হয়। আপনারা বোধ হয় পৌঁছেই জিপ ছেড়ে দিয়েছেন?"

"আমাদের তো হেঁটে-হেঁটেই কাজ," গুঁফো লোকটা সঙ্গীকে বললেন, "তাই না কর্মবীর?"

এতক্ষণে স্বর ফুটেছে মিতিনের। গুম্ফধারীকে বলল, "ও, আপনিই তা হলে শক্তিধর সমাদ্দার?"

কর্মবীর বিস্মিত মুখে বললেন, "আপনি ওর নাম জানলেন কী করে?"

"ওঁকে দেখে শক্তিধর বলে মনে হল কিনা," মিতিন চোখ তেরচা করল, "আপনি বছর দশেক আগে বক্সিংয়ে একবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সম্ভবত মিডল ওয়েটে। ঠিক বলছি?"

শক্তিধরের ভুরু জড়ো হল, "হ্যাঁ, তখন কাগজে ফোটো বেরিয়েছিল বটে। কিন্তু অ্যাদ্দিন পরও আপনার মনে আছে?"

"না, না। এখানকার রেজিস্টারেও তো আপনাদের নাম দেখলাম। তা আপনারা এখানে কী কাজে?"

"কাজ? কই না তো," কর্মবীর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমরাও বেড়াতেই এসেছি।

আমাদের দু'জনেরই জঙ্গল খুব প্রিয় কিনা। এই তো, এখন নৌকো নিয়ে বেরোচ্ছি।"

"সে কী, আপনারা নৌকো ভাড়া করে ফেলেছেন?" পার্থ হতাশ মুখে বলল, "আমরা যে ভাবছিলাম! তা ফিরছেন কখন?"

"ঠিক নেই। হয়তো সারাদিনই ঘুরব। ড্রাই লাঞ্চ মজুত করে নিয়েছি।"

বুমবুম হায়-হায় করে উঠল, "এ মা, তা হলে আমাদের নৌকো চড়ার কী হবে?"

"তোমরা কাল যেও," শক্তিধর বুমবুমের গাল টিপে দিলেন। খানিকটা যেন তড়িঘড়ি করে বললেন, "আমরা আসি তা হলে?"

অদূরে অপেক্ষা করছিল ডিঙি নৌকো। দু'জনে গিয়ে চড়তেই বয়স্ক মাঝি যাত্রা শুরু করেছেন। স্রোতের টানে ভালই গতি নিয়েছে ডিঙি। টুপুররা সেদিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে।

একটু পরে পার্থ বলল, "অতঃ কিম?"

টুপুর বলল, "আমরা তা হলে লবঙ্গিতেই রওনা হয়ে যাই।"

"তুৎ, সে তো যাব দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর। গাড়ি ছাড়া তো লবঙ্গি যাওয়া যাবে না, সুতরাং বিভূতিবাবুকে চাই।"

"কেন, তুমি ড্রাইভ করতে পারবে না? কিংবা মিতিনমাসি?"

"আমরা রাস্তা চিনি নাকি? বনেজঙ্গলে কোথায় ঘুরে মরব? তার চেয়ে বরং বাংলোর আশপাশেই চরে বেড়াই। বাংলোর পিছন থেকেই তো ফরেস্টের শুরু, ওদিকেও খানিকটা ঢুঁ মারতে পারি।"

সকালটা ফালতু-ফালতু গড়িয়ে যাক, কারওরই কাম্য নয়। সুতরাং সকলেই রাজি। চটপট বাংলোয় ফিরে পিছনে যাওয়ার রাস্তা ধরেছে। সামান্য একটু চড়াই, তারপর বনপথের শুরু।

উঠতে গিয়ে থমকাল টুপুর। তাদের বাংলোর পিছনে একটা শ্রীহীন ছোট্ট কোয়ার্টার। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিতিনমাসি। ঝুঁকে কী যেন করছে।

টুপুর দৌড়ে এল, "কী গো? কী দেখছ?"

মাটি থেকে একচিলতে গুঁড়ো তুলল মিতিন। আঙুলে ঘষে পরীক্ষা করে দেখছে গাঢ় সবুজ রঙের পাউডার। বিড়বিড় করে বলল, "ক্রোমিয়াম সালফেট!"

"সেটা কী?"

জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "এখন জঙ্গলে ঢুকে কাজ নেই। চল, আবার ঘড়িয়ালগুলোকে দেখি।"

॥ ৫ ॥

অতি ধীরে চলছিল গাড়ি। ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে। ভাঙাচোরা বলাটা ভুল, রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। গহিন অরণ্য চিরে প্রায় মাটির পথ মেরেকেটে সাত-আট হাত চওড়া। কোনও এককালে হয় তো ইটটিট পড়েছিল, এখন তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মুখে কুলুপ এঁটে পথের দু' পাশটা দেখছিল টুপুর। কী গাঢ় নিস্তব্ধতা! এমন নৈঃশব্দের মাঝে কথা বলা বুঝি মানায়ও না। জনপ্রাণীর আওয়াজ তো দূরস্থান, শোনা যাচ্ছে না কোনও পাখির ডাকও। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটা পর্যন্ত কানে লাগছে। জঙ্গল ক্রমশ এতই গভীর, স্পষ্টভাবে কিছু দেখার উপায় নেই। এই ঘোর দুপুরেও বনের মাঝে চাপ-চাপ অন্ধকার। হঠাৎ-হঠাৎ ঝোপঝাড় সামান্য নড়ে উঠলেই ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। মনে হয়, এই বুঝি হানা দিল কোনও বুনো জন্তু। মাঝে-মাঝেই পথের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝোরা। সন্তর্পণে সেই জল মাড়িয়ে এগোচ্ছে টুপুরদের জিপ। একবার যেন হরিণের ডাকও শোনা গেল। কিন্তু চোখে এসে ধরা দিল না কেউ।

স্তব্ধতার চাপ কমাতেই বুঝি কথা বলে উঠলেন বিভূতি, "কেমন লাগছে স্যার?"

"দুর্দান্ত," পার্থ পাশের সিট থেকে বলল, "ভেবেছিলাম হালকাপুলকা ফরেস্ট। কিন্তু এ তো দেখছি সিমলিপাল, সারান্ডাকেও হার মানায়। লবঙ্গি আর কদ্দূর?"

"আরও সাত-আট কিলোমিটার তো বটেই।"

"আগাগোড়াই এরকম? মাঝে কোনও ফাঁকা জায়গা নেই? গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফোটো তুলতাম।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আছে বইকি। একটু অপেক্ষা করুন।"

বলতে-বলতে মিনিট কয়েকের মধ্যে জঙ্গল একটু পাতলা হয়েছে। মিলেছে একফালি খোলা প্রান্তর। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ছাড়াও আরও কত লাল-লাল ফুল ফুটে আছে। গাছের পাতাগুলোও যেন লালচে লাগে ফুলের আভায়।

গাড়ি থামতেই টুপুর নেমে হাত-পা ছাড়িয়ে নিল। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে মিতিনের ঘাড় ঘুরছে এদিক-সেদিক। পার্থর শাটার টেপার বিরাম নেই। বুমবুম ঘাড় উঁচিয়ে দেখছে ফুলের মেলা।

হঠাৎ টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দ্যাখো, দূরে একটা হরিণ।"

বুমবুম পলকে সচকিত, "কই রে টুপুরদিদি?"

"ওই তো, বড় শাল গাছটার নীচে। ও'মা! একটা তো নয়, অনেক!"

টুপুরদের শো দেওয়ার জন্যই যেন হাজির হয়েছে চিতল হরিণের পাল। একটুও ভয় পাচ্ছে না মানুষকে। দিব্যি অসংকোচে দাঁড়িয়ে। হালকা বাদামির উপর সাদা-সাদা ছোপ। সুন্দর জীবগুলো কী সরল চোখে তাকাচ্ছে! আচমকা কোথায় যেন মৃদু শব্দ হল, অমনি দুদ্দাড়িয়ে পালাল হরিণের দল, লাফ মেরে-মেরে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "একটা শব্দ শুনেই ওরা হাওয়া মারল যে বড়?"

মিতিন বলল, "ওরা এমনিতেই ভিতু। তা ছাড়া, জঙ্গলের প্রাণীরা আগাম বিপদের গন্ধ পায়। হয়তো কাছেপিঠে নেকড়ে কিংবা প্যান্থার গোছের কিছু এসেছে।"

পার্থ সামান্য বিচলিত হয়েছে। বলল, "আর দেরি নয়। চলো, তা হলে আমরা জিপে উঠে পড়ি।"

মিতিন হেসে বলল, "ভয় পেয়ে গেলে?"

"তা কেন, সঙ্গে আমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা মোটেই সেফ নয়।"

"জন্তুটাকে দেখতে পেলে কিন্তু একটা দুরন্ত স্ন্যাপ নিতে পারতে।"

"চলো, গাড়িতে গিয়ে বসি তো। ওখান থেকেও কিছু মন্দ হবে না।"

বসে অপেক্ষা করাই সার। কোনও চারপেয়েই দর্শন দিল না। তবু টেলিলেন্স লাগিয়ে বেশ কয়েকবার শাটার মারল পার্থ।

বিভূতি ফের স্টার্ট দিয়েছেন গাড়িতে। আবার নিঝুম জঙ্গল। আবার এবড়োখেবড়ো পথ। পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গে বিস্কুটটিস্কুট কিছু এনেছ?"

মিতিন ভ্রুভঙ্গি করল, "এরই মধ্যে খিদে পেয়ে গেল?"

"যা ঝাঁকুনি, বাপ রে! ভাত, মাছের ঝোল হজম হয়ে গিয়েছে।"

"বুমবুমের চিপস আছে, চলবে?"

"দাও দু'-চারটে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক।"

অমনি বুমবুমের বায়না, "আমাকেও দাও, আমাকেও দাও।"

অগত্যা টুপুরই বা আর বাকি থাকে কেন! সেও চলেছে টকঝাল কচুভাজা চিবোতে-চিবোতে।

খানিকটা গিয়ে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "লবঙ্গি থেকে ফিরে আমরা কি আর বেরোব?"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "কোথায় আর যাব?"

"বা রে, তুমিই তো বললে জঙ্গলে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। গভীর রাতে সেখান থেকে নাকি অনেক জন্তু দেখা যায়।"

"উত্তম প্রস্তাব, যাওয়া যেতেই পারে," পার্থ পাশে তাকাল, "কী বলেন বিভূতিবাবু?"

"কোনটায় যাবেন?" বিভূতির পালটা প্রশ্ন।

"মানে? বিট অফিসার যে বললেন, একটাই ওয়াচ টাওয়ার?

হাতিবাড়ি না কোথায় যেন?"

"না তো, আরও দু'টো আছে। কদলিখোলা আর করদাপাড়া। অবশ্য হাতিবাড়ি যাওয়াই ভাল। বাকি দু'টোর দশা সুবিধের নয়।"

"ওখানে বাঘ-ভল্লুক কিছু দেখা যাবে?"

"এখন সম্ভাবনা কম। জলাশয় মতো বানানো আছে, আর আছে নুনের গর্ত। গরম আরও বাড়লে ঝরনাটরনাগুলো একেবারে শুকিয়ে যায়, তখন জানোয়াররা ওখানে জল খেতে আসে। তবে নুন চাটতে আসা দু'-একটা ভল্লুক কিংবা বুনো শূকর দেখতে পাবেন, এটুকু বলতে পারি। আর কপাল খুব ভাল থাকলে হাতি। বাঘ-টাঘ এখন আশাই করবেন না।"

পার্থ বুঝি একটু দমে গিয়েছে। বলল, "হাতি তো বোধ হয় আজই পেয়ে যাব, লবঙ্গিতে।"

"তা হলে আর বিভূতিবাবুকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন?" মিতিন বলে উঠল, "রাত্তিরটা উনি শান্তিতে ঘুমোন। কাল-পরশু তো হাতে থাকছে। তার মধ্যেই একদিন না হয়..."

"জো আপকা মর্জি ম্যাডাম।"

লবঙ্গির বনবাংলো এসে গিয়েছে। জিপ থামতেই দৌড়ে এল চৌকিদার। বুড়ো মানুষ, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, খালি গা, কাঁধে গামছা, গায়ের রং মিশমিশে কালো। মুখে আদিবাসী-আদিবাসী ভাব।

চৌকিদার বিভূতির চেনা। পার্থর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এ হল সুরজ মুন্ডা। সাতকোশিয়ার সব ক'টা বনবাংলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী।"

সুরজ ঘাড় নাড়লেন। ওড়িয়া ভাষায় বললেন, "হাঁ স্যার, পঁয়ত্রিশ বৎসর চাকরি করুছি।"

"বটে? তা হলে তো আপনার কাছে জঙ্গলের অনেক গল্প শোনা যাবে," পার্থ সোৎসাহে বলল, "তার আগে একটু চা পাওয়া যাবে কি?"

"এইনে করি আনুছি," বলেই দৌড়। টুপুররা ঘুরে-ঘুরে দেখল বাংলোটা। তিনটে ঘর, মাঝে ডাইনিং হল, সবই অবশ্য বন্ধ। সামনে খানিকটা খোলা জমি। সেখানে অনেক গাছ। শাল, সেগুন, শিশু কাঁঠাল। একটু দূরে লম্বা দেবদারুও চোখে পড়ল। একখানা পাহাড়ও দৃশ্যমান। পাহাড়ের নীচে খেত, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেশ লাগে দেখতে।

পার্থ বিভূতিকে জিজ্ঞেস করল, "বাংলোটা বন্ধ কেন? কেউ আসে না এখানে?"

"বুকিং দিচ্ছে না। জলের খুব সমস্যা তো এখানে।"

"টুলকায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওখানে তো টুরিস্ট যাচ্ছে। বাঘমুন্ডাতেও।"

"কিন্তু পুরানাকোট? ওখানে তো রেঞ্জ অফিস, লোকবসতি আছে, তবু বাংলোটা তো শুনশান মনে হল।"

"তার কারণ অন্য স্যার। পুরানাকোটের বাড়িটায় ভূত আছে।"

"হোয়াট?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনাআপনি দরজা খুলে যায়, খাওয়ার প্লেট থেকে খানা উবে যায়, নানারকমের গলা কানে আসে। বনদফতর এখন পারতপক্ষে কাউকে ওখানে পাঠায় না।"

সুরজ চা এনেছেন। হাতে-হাতে কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনামানুকু তো খুব অসুবিধা হইছি।"

পার্থ যেন ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, "কেন? কিসের অসুবিধে?"

"রাঙ্কুতি কি এ? টিকরপদার চৌকিদার তো ছুটিতে যাইছি।"

"যাহ, সে তো নিখোঁজ। তার তো পাত্তাই মিলছে না।"

"রাজু তো পরশু ঘরকো যাইছি। পনেরো দিনের আগে আসিবুনি।"

পার্থ আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে এত খবর কে দিল?"

"সুরজবুড়ার কান বড় লম্বা। জঙ্গলের সব কথা ভাসি আসে।"

"এ তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার!" পার্থর চোখ পিটপিট, "তা আর কী কথা আপনার কানে ভেসে এসেছে?"

"নুকিচুরি করে কেত্তে-কেত্তে সব জন্তু মারে। এনে কেই দেখি পারিনি।"

"তাই নাকি? শুনছিলাম বটে গত বছর দু'খানা চিতা খুন হয়েছে।" পার্থ মাথা নাড়ল, "আর কী-কী জন্তুকে টার্গেট করে?"

"এত্তেদিনি হরি মার খেলা। এনে ঘড়িয়া মারুছি।"

"ঘড়িয়া? মানে ঘড়িয়াল?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বলেন কী? এমন নিরীহ মেছো কুমিরদেরও?"

মিতিন মন দিয়ে কথোপকথন শুনছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "অবাক হওয়ার কিছু নেই পার্থ। ঘড়িয়ালের চামড়া যে কত মহার্ঘ, তা টুপুরও জানে।"

"তা বটে। কিন্তু..."

পার্থর তবু যেন মন খুঁতখুঁত। এদিকে চার-চারজন শ্রোতা পেয়ে সুরজ উজাড় করে দিচ্ছেন তাঁর গল্পের ঝাঁপি। সেই অনেক-অনেক বছর আগে রইস লোকজন কীভাবে কাঁধে বন্দুক চাপিয়ে বাঘ, ভল্লুক শিকারে আসত। তারপর এক সময় জন্তু-জানোয়ার মারার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সরকার। রায়গড়া, পদ্মাতোলা আর মহানদীর জঙ্গল মিলিয়ে হয়ে গেল একটাই বন। ভাল লোক তো আর আসেই না, এখন শুধু দুষ্টু ছেলে-ছোকরার উপদ্রব। তারা যেখানে-সেখানে পিকনিক করে, গাঁকগাঁক করে গান চালায়, ভয়ে জন্তুরা আর তেমন বেরোয়ই না।

নিজের ভাষায় চলছে সুরজের বকবকানি। প্রথমটা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু ক্রমেই যেন পার্থর বোধগম্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। কেটে পড়ার জন্য ঘন-ঘন ইশারা করছে বিভূতিকে। কোনওক্রমে ছাড়া পেয়ে বিভূতিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন।

গাড়ি চলতেই টুপুরের গলায় আফশোস, "এ মা, আমাদের তো লবঙ্গিতে হাতি দেখা হল না!"

বিভূতি বললেন, "হাতিরা বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকে না। অনবরত স্থান বদলায়। টিকড়পাড়া ফেরার আর একটা রাস্তা আছে। খুব খারাপ পথ। আরও ঘন জঙ্গল। ওই দিক দিয়ে গেলে হয়তো কিছু জানোয়ার চোখে পড়বে। যদি বলেন তো..."

"কোনও দরকার নেই," মিতিন সরাসরি নাকচ করে দিল, "জঙ্গলে তো আসা বুনো-বুনো ভাবটা এনজয় করতে। সেটা তো পুরো মাত্রায় হচ্ছে। জন্তুজানোয়ার দেখার জন্য কলকাতার চিড়িয়াখানাই কি যথেষ্ট নয়?"

পার্থ ক্ষীণ স্বরে বলল, "তবু ন্যাচারাল পরিবেশে বন্যপ্রাণী দেখার মজাটাই তো আলাদা।"

বুমবুম বলল, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।"

মিতিন বলল, "না, এখন সোজা বাংলো। রাতে যদি জাগতে পারো, ওয়াচ টাওয়ারে বসে দেখো।"

অগত্যা আগের পথেই প্রত্যাবর্তন। রুমে এসে কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খেল পার্থ। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চলল বিভূতিকে জপাতে। বিকেলে গরম-গরম পকোড়া চাই কিনা!

লনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিল মিতিন। টুপুরও একটা চেয়ার টেনে বসল পাশে। দেখছে নদীর ওপারের পাহাড়, বাঁক খাওয়া রুপোলি নদী। শেষ সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে জলটা। কাছেই একটা গাছে তিনটে মিশকালো পাখি এ ডালও ডাল করছে। ভীমরাজ নাকি? একটা টিয়ার ঝাঁক মহানদীর ওপার থেকে ফিরছে। ট্যা ট্যা করতে-করতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে।

টুপুর আত্মগতভাবে বলল, "বিকেলটা এখানে দারুণ, তাই না মিতিনমাসি?"

মিতিনের কোনও সাড়াশব্দ নেই। টুপুরের হঠাৎই মনে হল, মাসি যেন বড্ড চুপচাপ। ফেরার পথে গাড়িতেও বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না। কী যেন ভাবছে সারাক্ষণ।

টুপুর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "কী এত চিন্তা করছ গো?"

সামান্য মাথা ঝাঁকাল মিতিন। তারপর বলল, "একটা সংশয় মনে উঁকি দিচ্ছে, বুঝলি।"

"কীরকম?"

"যেমন ধর, রাজু নামের চৌকিদারটির হঠাৎ প্রস্থান। বিট অফিসার কিছুই জানেন না, অথচ সুরজ বলছেন, সে নাকি ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে।"

"হয়তো সুরজ ভুল জানেন। কিংবা রাজু হয়তো বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবরটবর পেয়েছে।"

"কিন্তু বিট অফিসার তো পাশেই থাকেন। তাঁকে বলে যাবে না?"

"উনি তো বলছিলেন, রাজুর নাকি এরকম অভ্যেস আছে।"

"হুম। তারপর ধর, কর্মবীর আর শক্তিধরই শুধু তাঁবুর বুকিং পেলেন।"

টুপুর উৎসুক মুখে বলল, "তুমি কি কোনও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ?"

"উঁহু, তার চেয়েও বেশি। মনে হচ্ছে, কোথাও একটা নোংরা খেলা চলছে। আর সেই খেলাটা খুবই ভয়ংকর।"

"তুমি কী বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি নিজেও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না যে। আবছা-আবছা ক'টা সুতো দেখতে পাচ্ছি শুধু। যতক্ষণ না ওগুলো স্পষ্ট হচ্ছে, জোড়াও যাবে না।"

এক-এক সময়ে কী যেন হেঁয়ালি করে মিতিনমাসি, মাথামুন্ডু ঠাহর করাই দায়। তবে যাই হোক, টুপুরকে এড়িয়ে তো কিছু করবে না মাসি।

ভাবনার মধ্যেই রাশি-রাশি তেলেভাজা হাজির। পাহাড়প্রমাণ বেগুনি, পেঁয়াজি, আলুর চপ, কিছুই বাদ নেই। বড় প্লেটে সাজিয়ে এনেছেন বিভূতি। পাশে উল্লসিত মুখে পার্থ আর বুমবুম। কচর-কচর মুখ চলছে বাপ-ছেলের।

পার্থ আহ্লাদিত স্বরে বলল, "খেয়ে দ্যাখো, তোমার কালকের রাতের বেগুনির চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।"

মিতিন একটা বেগুনি তুলে নিল। কামড় দিয়ে বলল, "মন্দ নয়, তবে নুন একটু কম।"

পার্থ বলল, "ওফ, কিছুতেই প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পার না। একদম নিখুঁত হলে কি প্রেসের ব্যবসায় পড়ে থাকতাম? জমিয়ে তেলেভাজার দোকান দিতাম একখানা।"

"আর নিজেই খেয়ে সাফ করতে," টুপুরও মজা জুড়ল, "আর দিনের শেষে ক্যাশবক্সে পড়ে থাকত লবডঙ্কা।"

"মোটেই না। তোর মাসি টিকটিকিগিরি করে যা কামায়, তার তুলনায় ঢের বেশি পয়সা আসত," পার্থ আর একটা চেয়ার টেনে বসল। তির্যক সুরে বলল, "কত কেসে যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, হিসেব করে দেখেছিস কখনও?"

এমন একটা অপবাদ মিতিনমাসির আছে বটে। অনেক সময়েই

সরকারি কেসে বিনা পয়সায় খেটে দেয় আই জি অনিশ্চয় মজুমদারের অনুরোধে। এই জঙ্গলেও যদি কোনও রহস্যের সন্ধান পায়, সেটাও কি বেগারখাটা হবে? হয়তো বা!

বিভূতি হাসি-হাসি মুখে পাশের বাংলোটা দেখছিলেন। হঠাৎই বলে উঠলেন, "মাস্টারমশাই আর ছাত্র খুব জঙ্গলে ঘুরছেন দেখি! এখনও ফিরলেন না!"

"রাতে খাওয়ার সময়ে ঠিক গুটিগুটি পায়ে হাজির হবেন," বলেই পার্থ তর্জনী তুলে মিতিনকে বলল, "আজ কিন্তু ওঁদের আর নেমন্তন্ন নয়। নিজেরা যা পারে, রেঁধে খান।"

নিমন্ত্রণ করা, না করার অবশ্য প্রয়োজন হল না। সুবাহু ভিড়লই না রান্নাঘরের দিকে। পুরানাকোট থেকে সম্ভবত কিছু শুকনো খাবার কিনে এনেছে, তাই দিয়েই সারবে নৈশাহার।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পার্থ মন দিয়ে আজকের তোলা ফোটোগুলো দেখছিল। তাকে ঘিরে মিতিন, টুপুর আর বুমবুম। নিজের তোলা ফোটোতে নিজেই ভারী মুগ্ধ পার্থ। বাহ, বাহ, ধ্বনি ঠিকরোচ্ছে গলা থেকে। তার আত্মতারিফের ঘটায় টুপুর তো হেসে খুন। উজ্জ্বল মুখে ক্যামেরাটা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়েছে পার্থ। বলল, "দ্যাখো, ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি কাকে বলে একটু বোঝার চেষ্টা করো।"

সরু চোখে প্রত্যেকটি ফোটো নিরীক্ষণ করছিল মিতিন। পাহাড়, নদী, শাল, সেগুন, আসান, কুরুম, শিরীষ, মহুল গাছে ভরা বন। লাল-লাল ফুল, হরিণ, চকিতে হরিণের পালিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ মিতিনের দৃষ্টি স্থির। একটা ফোটো দেখছে জুম করে। পার্থকে বলল, "এটা একটু ডিপলি ওয়াচ করো তো। গাছের ওপাশে ওটা কী? মানুষ না?"

"হ্যাঁ, তাই তো," পার্থ ঝুঁকল, "দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে যেন!"

মিতিন আরও জুম করল ফোটোটাকে। বিড়বিড় করে বলল, "ওদের হাতে..."

"রিভলভার!" পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "রিভলভারই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা কারা?"

মিতিন বলল, "চিনতে পারলে না? কর্মবীর আর শক্তিধর।"

॥ ৬ ॥

সকালে নৌকো চড়তে-চড়তে বেলা দশটা বেজে গেল। চওড়া পাটাতনে বসেছে টুপুর আর পার্থ। মাঝে বুমবুম। উলটো দিকে সালোয়ার কামিজে মিতিন, গলায় তার বাইনোকুলার। আকাশে আজ বেশ মেঘ, দমকা বাতাস উঠছে হঠাৎ-হঠাৎ। স্রোতের অভিমুখে চলা নৌকো দুলে-দুলে উঠছে। অমন ছটফটে বুমবুম ভয়ে জড়সড়।

টুপুরেরও যে বুক ঢিপঢিপ করছিল না, তা নয়। তবে অন্য একটা চিন্তা তাকে আরও বেশি ভাবাচ্ছে যে। ধরেই রেখেছিল আজ আবার ঘাটের পথে দেখা হবে শক্তিধর আর কর্মবীরের সঙ্গে। কিন্তু কী কাণ্ড, তাঁবু বেবাক ফাঁকা! তাদের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ জেগেছে বলেই কি পালাল লোক দু'জন? শূন্য তাঁবুটা তন্নতন্ন করে খুঁজল মিতিনমাসি। মিলল শুধু একটা ছেঁড়াখোঁড়া কার্বন পেপার। মূল্যবান হিরেজহরতের মতো সেটাই ব্যাগে পুরল মিতিনমাসি। কী কম্মে লাগবে কে জানে!

ওই লোক দু'জন যে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে জঙ্গলে ঢুকেছেন, তাতে আর টুপুরের কোনও সন্দেহ নেই। পার্থমেসোরও না। ক্যামেরার মনিটরে দুই মূর্তিমানকে আবিষ্কার করেই ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল পার্থমেসো। তর্জনী উঁচিয়ে বলল, "ওঁরা নির্ঘাত চোরাশিকারি। জঙ্গলে জন্তু মারতে এসেছেন।"

"আমারও তাই মনে হয়," টুপুর বলেছিল, "হরিণগুলোকে বোধ হয় তাক করছেন। হরিণের চামড়ার যা দাম!"

"হতেই পারে। হয়তো এক-আধটাকে মেরেও ফেলেছেন। আমাদের এখন তা হলে কী করা উচিত?"

"বিট অফিসারকে জানাবে? নাকি পুলিশকে?"

"সরাসরি ওঁদের তাঁবুতে গিয়ে হানাও দিতে পারি।"

"থাক। রাত্তিরবেলা এখন আর শোরগোল তুলে লাভ নেই। অত বীরত্বও দেখাতে হবে না," মিতিনমাসি সরাসরি উৎসাহে জল ঢেলে দিল, "যাও, এখন সবাই শুয়ে পড়ো তো।"

"তুমি ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছ না?"

"নিয়েছি বলেই তো ঘুমোতে বলছি। সকালে তা হলে শরীর-মন তাজা থাকবে। তখন নয় অভিযানে নামব।"

মিতিনমাসিকে আর ঘাঁটায়নি বটে, কিন্তু প্রস্তাবটা মোটেই মনঃপূত হয়নি পার্থমেসোর। আর এখন খাঁ খাঁ তাঁবুটি দেখা ইস্তক তার মুখ রীতিমত গোমড়া। নদীর দু' পাশে সবুজের বাহার, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অরণ্য ক্রমশ উঠে গিয়েছে উপরপানে। গাছে-গাছে কত রঙের যে ফুল! এমন অপরূপ দৃশ্য পার্থমেসো যেন দেখেও দেখছে না। শুধুই যান্ত্রিক ভাবে এলোমেলো শাটার টিপে চলেছে ক্যামেরায়। নদীর ওপারেও নাকি চিতল, শম্বর, নীলগাই, চৌশিভার দর্শন মেলে। আছে ভল্লুক, আছে হাতির পাল। বনপথ ধরে নাকি প্রায় কটক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়। দাঁড় বাইতে-বাইতে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ মাঝি। পার্থমেসো যেন শুনেও শুনছে না। সাতকোশিয়া সম্পর্কে তার যেন আর আগ্রহই নেই।

তার মাঝেই হঠাৎ মাঝিকে মিতিনের প্রশ্ন, "কাল ওই বাবুদের কতক্ষণ নৌকো চড়ালেন?"

"বেশি নয়, জোর এক ঘন্টা।"

"মাত্র? তারপর ওঁরা ফিরে এলেন?"

"না তো। ওঁরা এক জায়গায় নৌকো দাঁড় করিয়ে পারে নেমে গেলেন।"

"ওসব জেনে আর কোনও লাভ আছে?" পার্থর বিদ্রূপ উড়ে এল, "সময়কালে কোনও ব্যবস্থা নিলে না, পাখি তো ফুড়ুৎ।"

"অত সোজা নয় স্যার। জঙ্গল ছেড়ে যাবেন কোথায়?"

"যেখানে খুশি। গোয়েন্দাম্যাডাম নিশ্চয়ই দেখেছেন, বাংলোর কাছ থেকেই আঙুলের বাস ছাড়ে। ভোরবেলা যদি সেই বাসে চেপে থাকেন, এতক্ষণে তাঁরা..."

"এক সেকেন্ড। তাঁরা যদি শিকারই করে থাকেন, তা হলে সেই মরা জন্তুটন্তু নিয়েই গিয়েছেন নিশ্চয়ই?"

"তা কেন। চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।"

"রাতারাতি ওই কাজটি সম্ভব নয় পার্থ। জন্তুজানোয়ারের ছাল ছাড়ানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। মেরেই অমনি কাঁধে চামড়া নিয়ে পালানো যায় না। চামড়াটাকে শুকোতে হয়। সময় লাগে। অন্তত তিন-চারদিন।"

"তা হলে হয়তো আছেন কোথাও ঘাপটি মেরে। এখন গোটা জঙ্গল ঢুঁড়ে দেখা কি সম্ভব? কাল রাতেই যদি পাকড়াও করতে পারতাম..."

"কাল রাতে ওঁরা তাঁবুতে ফেরেননি। সোলার ব্যাটারির আলোও জ্বলেনি। আমি দেখেছি।"

পার্থ চুপসে গেল। মিতিন ফের প্রশ্ন ছুড়েছে মাঝিকে, "তা ওঁরা দু'জন কাল নামলেন কোথায়?"

"এই তো, একটু সামনে। মহানদী যেখানে চওড়া হয়েছে, তার শুরুতেই।"

"ও।"

আর কিছু না বলে আইফোনখানা ব্যাগ থেকে বের করল মিতিন। কী যেন দেখছে মনিটরে, আর বারবার তাকাচ্ছে পারের দিকে। বুঝতে না পেরে টুপুর চোখ সরাল বাঁয়ে, সাতকোশিয়ার পাহাড়ে। এখন নদী থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে কেন জায়গাটাকে সাতকোশিয়া গর্জ বলে। খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদী যেন এক সরু গিরিখাত ধরেই বইছে। এমন একটা নদীতে সে এখন নৌকোয়, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ঠিক তখনই বুমবুমের চিৎকার, "অ্যাই টুপুরদিদি, দ্যাখ-দ্যাখ, কুমির!"

"হ্যাঁ, তাই তো!" টুপুরের চোখ বড়-বড়। পারের কাছে একটা পাথরের উপর দিব্যি শুয়ে আছে ঘড়িয়ালটা। গায়ের রং পাথরের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে, হঠাৎ দেখলে ঠাহর করা কঠিন। বেশ পেল্লাই সাইজ। কম করে পনেরো-ষোলো ফুট তো হবেই।

হঠাৎ টুপুরদের চমকে দিয়ে নড়ে উঠল ঘড়িয়ালটা। পাথর ছেড়ে ধীর পায়ে নেমে পড়েছে জলে। অমনি কী তার গতি! জলে গা ভাসিয়ে শাঁই শাঁই ছুটছে।

বুমবুম টুপুরের হাত চেপে ধরল, "অ্যাই দিদি, ও তো নৌকোর দিকেই আসছে! কী হবে এখন?"

বৃদ্ধ মাঝি বলে উঠলেন, "ভয় পেও না খোকা। ওরা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। দ্যাখো, কেমন নৌকোর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে।"

মাঝির কথা মেনেই যেন নৌকোর কাছাকাছি এসে সুড়ুৎ করে ডুব দিল ঘড়িয়াল। তারপর চলেছে পাশে-পাশে নৌকোর পাহারাদার হয়ে। যেতে-যেতেই মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘোরাচ্ছে ঘড়িয়াল। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। স্প্রিংয়ের মতো।

বুমবুম বলল, "ও ওরকম করছে কেন?"

মাঝির ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, "মছলি খাচ্ছে বেটা।"

"কোথায় মাছ? দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পার্থর মেজাজ সমে ফিরেছে। হেসে বলল, "দেখতে পেলে আমরাই ঘড়িয়াল বনে যেতাম রে! সাঁতার কাটতে-কাটতেই ওরা আশপাশটা দেখতে পায়। আর সুড়ুৎ-সুড়ুৎ মৎস্য গেলে।"

কথার মাঝেই কখন যেন দিক পরিবর্তন করেছে ঘড়িয়াল। ক্রমশ সরে যাচ্ছে তীরের পানে। হেলেদুলে উঠে পড়ল পারে। আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল তক্ষুনি।

প্রতিটি দৃশ্যই সযত্নে লেন্সবন্দি করেছে পার্থ। খুশি-খুশি মুখে বলল, "ঘড়িয়ালটা বড় লক্ষ্মী রে! না চাইতেই দিব্যি কেমন একটা শো দিয়ে গেল।"

"মুখখানাও ভারী খাসা," টুপুর টিপ্পনী জুড়ল, "ঠিক যেন হিন্দি ফিল্মের ভিলেন।"

"যাহ, মোটেই ভিলেন নয়। কী চমৎকার শান্ত ব্যবহার। কুমিরঘড়িয়াল সম্পর্কে আমার ধারণাটাই বদলে গেল।"

"বদলানোই তো উচিত," অনেকক্ষণ পর কথা বলল মিতিন। ঘড়িয়ালের দৃশ্যটি উপভোগ করার পর আবার তার দৃষ্টি মোবাইলের মনিটরে। অল্প মাথা দুলিয়ে বলল, "হাঙর, কুমির, সাপ, বাঘ, ভল্লুক, কেউই তেমন খারাপ জীব নয়। এদের চেয়ে বরং মানুষ অনেক বেশি হিংস্র প্রাণী। ওরা আক্রমণ করে পেটের দায়ে। আর মানুষ খেয়ালখুশি মতো জন্তুজানোয়ার হত্যা করে।"

টুপুর উৎসাহী মুখে মাসির কথায় সায় দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জোর দুলে উঠেছে নৌকো। একটা বাঁকের পর হঠাৎই যেন মুখটা খুলে গেল নদীর। অনেকটা চওড়া হয়ে গিয়েছে। প্রায় তিন গুণ। এখন আর পাহাড়ি নদী বলে মনে হচ্ছে না, থইথই করছে জল।

বাঁদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কালকের বাবুরা এখানেই নেমেছিলেন?"

মাঝির ঘাড় নড়ল, "হাঁ দিদি। নেমেই লাফাতে-লাফাতে পাহাড়ে উঠে গেলেন।"

মোবাইলের মনিটরে চোখ রেখে মিতিন পার্থকে বলল, "আমার জি পি এস যা বলছে, এখান থেকে লবঙ্গির জঙ্গল পঁচিশ কিলোমিটার। মানে, কর্মবীর আর শক্তিধরকে যেখানে দেখা গিয়েছে।"

পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, "তো?"

"কাল ওঁদের ফোটোটা তুলেছিলে অ্যারাউন্ড সাড়ে তিনটেয়। আর উনি এখানে ল্যান্ড করেছিলেন মোটামুটি সাড়ে দশটায়। অর্থাৎ, জঙ্গলের পথে মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছেন।"

"হুম। বোঝাই যাচ্ছে দু'জনেই দারুণ এক্সপার্ট।"

"একটু বেশি মাত্রায় এক্সপার্ট। হিসেবটা আমার মিলছে।"

"কী হিসেব?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন চোখ রাখল বাইনোকুলারে। মন দিয়ে দেখছে কী যেন। পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। মিতিনের মাথায় কিছু যে একটা পাক খাচ্ছে, টের পাচ্ছে দু'জনেই। তবে এখন যে মিতিন আর মুখ খুলবে না, সেটা তারা দু'জনেই জানে।

অগত্যা মাঝির সঙ্গে কথোপকথন চালু করল পার্থ। জিজ্ঞেস করল, "এই নদীই তো কটকে যাচ্ছে, তাই না?"

"হাঁ স্যার। কটক পেরিয়ে সেই পারাদ্বীপে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে।"

"ও। তা কটক এখান থেকে কদ্দূর? মানে এই নদীপথে?"

"তা তিরিশ-চল্লিশ মাইল হবে। দাঁড় টানটে-টানতে মাঝি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। বলিরেখা ভরা কপালে আরও কিছু ভাঁজ পড়ল যেন। পার্থকে বললেন, "বাবু, চলুন, এবার ফেরা যাক।"

"এত তাড়াতাড়ি? কেন?"

"আকাশের মতিগতি ভাল ঠেকছে না। এখানে নদীর স্রোতটাও খুব খারাপ। ঝড় উঠলে নৌকো উলটে যেতে পারে।"

"যাহ, কিচ্ছু হবে না। আপনি চলুন তো।"

"না পার্থ, ওঁকে জোর কোরো না," মিতিনের স্বর বেজে উঠল, "নদীতে মাঝির কথা অমান্য করতে নেই। উনি যখন আর এগোতে চাইছেন না, তখন ফিরে যাওয়াটাই সঙ্গত।"

পার্থ হতাশ মুখে বলল, "তবে আর কী। হাইকমান্ড যখন নির্দেশ দিয়েছে, চলো এবার উজান পথে।"

তা যেতে এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। স্রোতের বিপরীতে ফিরতে দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ঘাটে যখন টুপুররা নামল, আকাশ মেঘে ছাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় দুলছে জঙ্গলের গাছপালা। ফাঁকা তাঁবুটা একবার আলগা নিরীক্ষণ করে এক দৌড়ে বাংলোয় পৌঁছে গেল বুমবুম আর টুপুর।

বনবাংলোর পিছনের জঙ্গল থেকে নেমে আসছিল সুবাহু। কাঁধে গিটারের বাক্স। টুপুরদের দেখে একগাল হাসি, "তোমাদের সকালের বোটিং প্রোগ্রাম ওভার?"

"হ্যাঁ," বুমবুম ঘাড় দোলাল, "আজ একটা বিরাট ঘড়িয়াল দেখেছি। জ্যান্ত।"

"হা হা হা। জ্যান্ত ঘড়িয়াল তো এখানেও দেখেছ, খাঁচায়।"

"ওগুলো যেন কেমন-কেমন," বুমবুম মুখে বেঁকাল, "মেশিনের মতো হাঁ করে, মেশিনের মতো মুখ বোজে।"

মিতিন-পার্থও এসে গিয়েছে। পার্থ স্মিত মুখে সুবাহুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি একা যে? স্যার আজ বেরোননি?"

"স্যারের একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে।"

"মশাটশা কামড়ায়নি তো? জঙ্গল মসকিউটো কিন্তু হাইলি ডেঞ্জারাস। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া হয়ে যায়।"

"তাই তো ভাবছি। এখনও স্পেসিমেন কালেকশান চলছে, আরও দিন পাঁচেক থাকতে হবে।"

"জঙ্গলে পদে-পদে বিপদ," পার্থ চোখ ঘোরাল, "তার উপর আবার উটকো দু'খানা বিপদ এসে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে।"

"মানে?"

"ওই যে দু'টো লোক তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন, ঘোরতর সন্দেহজনক। এবং বিপজ্জনক।"

"কেন? ওঁরা আবার কী করলেন?"

"জঙ্গলের মধ্যে খোলা রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"তাই নাকি?" সুবাহু থতমত, "আপনারা দেখলেন রিভলভার নিয়ে ঘুরতে?"

"উঁহু। আমার ক্যামেরা দেখেছে," পার্থ গলা নামাল। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিতিনকে দেখিয়ে বলল, "আমার মিসেস তো ডিটেক্টিভ, উনি জঙ্গলে তোলা ফোটোগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ বের করলেন, দু'জনেরই হাতে আর্মস।"

চোখের কোণ দিয়ে একবার মিতিনকে দেখে নিয়ে সুবাহু বলল, "খুব অ্যালার্মিং ব্যাপার তো!"

"অবশ্যই। কিছু একটা গড়বড়ে ঘটনা চলছে জঙ্গলে। আমার মিসেস তার স্মেল পেয়েছেন।"

"তাই বুঝি উনি গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছেন?" সুবাহু হাসছে, "আপনাদের বেড়ানো তো তা হলে ডকে।"

"আরে না, এই তো খেয়ে উঠেই আবার বেরোব," বলেই পার্থর হাঁক, "বিভূতিবাবু, আপনার রান্না কদ্দুর?"

"খানা রেডি," বিভূতির জবাব উড়ে এল, "আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন, আমি নিয়ে আসছি।"

পার্থ আর মিতিন ঢুকে গেল রুমে। বুমবুম টানছে টুপুরকে, "অ্যাই, চল না একবার খাঁচার ঘড়িয়ালগুলোকে দেখে আসি।"

"কেন রে?"

"এমনি। ইচ্ছে করছে।"

"আজব বাসনা! খিধেয় পেট চুঁইচুঁই, এখন বাবুর ঘড়িয়াল দেখার শখ জেগেছে!"

পায়ে-পায়ে দুই মূর্তি খাঁচার সামনে হাজির। ছোট-ছোট ঘড়িয়ালগুলো নড়াচড়া করছে বটে, কিন্তু বড় দুই ঘড়িয়াল শুয়ে আছে স্থির।

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই, অ্যাই, তোরা জাগ না।"

ঘড়িয়ালযুগল নিথর।

বুমবুম খাঁচা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, "অ্যাই, ওঠ না, ওঠ না।"

টুপুর হেসে বলল, "কী পাগলামি করছিস? ওরা তোর ভাষা বুঝতে পারবে নাকি?"

"পারতেও তো পারে," পিছনে হঠাৎ সুবাহুর গলা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, "আবার ডাকো। আর-একবার ডাকো।"

কিমাশ্চর্যম! বুমবুম তৃতীয়বার গলা চড়াতেই চোয়াল ফাঁক হতে শুরু করেছে ঘড়িয়ালের। ক্রমশ বড় হচ্ছে হাঁ। আবার আস্তে-আস্তে বুজেও গেল।

বুমবুম আহ্লাদে আটখানা। হাততালি দিচ্ছে। টুপুরও খুশি। তবু কেমন একটা যেন খটকা লাগছিল টুপুরের। হঠাৎই।

॥ ৭ ॥

টুলকার পথও রীতিমতো দুর্গম। শাল, সেগুন শিশুগাছ তো বটেই, আরও কত যে লতা আর ঝোপঝাড়ে ভরে আছে জঙ্গল। মেঘলা আকাশে সূর্যও আজ মুখ লুকিয়েছে। বিকেল হওয়ার আগেই ঘোর আঁধার নামছে পথে। রাস্তাও ভারী উঁচু-নিচু, জিপ প্রায় লাফাতে-লাফাতে চলেছে। কপাল ভাল, পথে দু'খানা বাইসনের দর্শন মিলল। বাঁকানো শিং, মহিষের মতো দেখতে প্রাণীগুলো ভারী শান্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে রাস্তা জুড়ে। পার্থ তো মহা পুলকিত। তক্ষুনি লাফিয়ে নেমে ফোটো তুলতে যাচ্ছিল। নিষেধ করলেন বিভূতি। যতই নিরীহ মনে হোক, বাইসন নাকি অতি ভয়ংকর, বাঘও তাকে সমঝে চলে। বিরক্ত হলে এমন তেড়ে আসবে, পার্থকে শিঙে না গেঁথে ছাড়বে না। আর তা না পারলে ঢুঁসো মেরে-মেরে ক্ষতি করে দেবে গাড়িটার।

অগত্যা গাড়িতে বসেই শাটার টিপছে পার্থ। স্টার্ট বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে থাকার পর সন্তর্পণে একবার মাত্র হর্ন বাজালেন বিভূতি। ভারী অবহেলাভরে গাড়ির দিকে একবার মাত্র তাকাল বাইসন দু'টো, তারপর দুলকি চালে সেঁধিয়ে গেল জঙ্গলে। জিপ ফের চলতে শুরু করার পর বনের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে প্রাণী দু'টোকে খুঁজল টুপুর। নাহ, কোথাও নেই। বড়সড় দুটো বাইসন যেন মিশে গিয়েছে গাছপালায়।

টুপুর নিজের মনেই বলল, "যাহ, পুরো ভ্যানিশ!"

মিতিন বলল, "হ্যাঁ রে। জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীদের নড়াচড়া একদম টের পাওয়া যায় না। হয়তো খুব কাছেই রয়েছে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি না।"

বিভূতি বললেন, "তাই তো জঙ্গলে খুব সতর্ক থাকতে হয়। সর্বদা সজাগ রাখতে হয় চোখ-কান।"

"নিঃশব্দে চরে বেড়ানোর ব্যাপারে হাতি সবচেয়ে সাংঘাতিক।"

মিতিন মাথা নেড়ে সায় দিল, "হঠাৎ দেখবি সামনে এসে হাজির। অথচ তার দু' সেকেন্ড আগেও শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজটা পর্যন্ত পাবি না।"

কথা বলতে-বলতেই ছোট একটা গ্রাম পেরোল গাড়ি। টিনের বোর্ডে নাম ঝুলছে গ্রামের, 'ছোটকাই'। আবার ঘন জঙ্গল শুরু।

বুমবুম প্রশ্ন জুড়েছে, "এখানে লোক থাকে কেন? ভয় করে না?"

টুপুর বিজ্ঞের মতো বলল, "গ্রামের লোকদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তারাও জন্তুজানোয়ারদের ঘাঁটায় না, জন্তুরাও তাই তাদের ক্ষতি করে না।"

"অতটা সিম্পল নয় রে," পার্থ ফোড়ন কাটল, "এখানকার মানুষদের যথেষ্ট লড়াই করে বাঁচতে হয়।"

বুমবুমের চোখ বড়-বড়, "কীরকম লড়াই?"

"যখন যেমনটা প্রয়োজন। ভল্লুক, চিতা তো প্রায়শই হানা দেয় গ্রামে। তখন ওরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরোয়। তবে সব চেয়ে মুশকিল, যখন হাতির পাল চড়াও হয়। খেতের ফসল নষ্ট করে। বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তখন গাঁয়ের লোক দলবেঁধে বেরিয়ে এসে ক্যানেস্তারা পেটায়।"

"তা হলেই হাতিরা পালায়?"

"হ্যাঁ, ওই ক্যানেস্তারার আওয়াজটাকে ওরা একটু ভয় পায় কিনা। অনেক সময় অবশ্য ক্যানেস্তারাতেও কাজ হয় না। তখন ফরেস্ট গার্ডরা এসে..."

বলার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিকট শব্দ। ঘ্যাচাং ব্রেক কষেছেন বিভূতি। লাফিয়ে নেমে পড়লেন সিট ছেড়ে। জিপের পিছন থেকে ঘুরে এসে বললেন, "ঝামেলা হয়ে গিয়েছে স্যার। টায়ার বার্স্ট করেছে।"

পটকা ফাটার মতো আওয়াজটায় বেজায় চমকেছিল টুপুর আর বুমবুম। উদ্বিগ্ন মুখে টুপুর বলল, "তা হলে কী হবে এখন? গাড়ি আর যাবে না? এই জঙ্গলের মধ্যে?"

"ভয় পাচ্ছ কেন? বদলি টায়ার তো সঙ্গে আছে। তোমরা নেমে দাঁড়াও, আমি লাগিয়ে ফেলছি। আর জঙ্গল তো শেষ। টুলকা প্রায় এসেই গিয়েছে। টুলকায় টায়ার সারানোর একজন মিস্ত্রি আছে। তোমরা যতক্ষণ টুলকায় ঘুরবে, আমি ততক্ষণে খারাপ টায়ারটা মেরামত করে নেব।"

সত্যি, টুলকা আর বেশি দূরে নয়। টায়ার বদলে সেখানে পৌঁছতে মিনিট পনেরো মতো লাগল। ছোট্ট জনপদ। ছড়িয়েছিটিয়ে আছে সবজির খেত। মাটির ঘরের পাশাপাশি পাকা বাড়িও আছে অল্প কিছু।

হাঁটতে-হাঁটতে বনবাংলোর দিকটায় গেল টুপুররা। গেটের মুখেই বনবিভাগের এক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা। টুপুররা কিছু বলার আগেই সে দু' হাত নাড়ছে, "কোই রুম খালি নেহি হ্যায়। সব ফুল হ্যায়।"

পার্থ কৌতূহলী মুখে বলল, "বহুত টুরিস্ট আয়া হ্যায় কেয়া?"

"হাঁ সাব। কোঈ জাগাহ নহি মিলেগা। কাল দো সাব আয়ে থে, উনকো ভি হম ওয়াপস ভেজ দিয়া।"

"দো সাব?" মিতিনের ভুরু জড়ো, "দিখনেমে ক্যায়সে থে উয়োলোগ?"

"বহুত তাকতদার। কন্ধামে বহুত বড়া-বড়া ঝোলা থা। এক সাবকা মোটি মোচ থি।"

মিতিন হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করল, "কখন এসেছিলেন তাঁরা?"

হিন্দিতেই জবাব এল, "সন্ধের পর। সাতটা-আটটার সময়।"

"জায়গা না পেয়ে ওঁরা কী করলেন? চলে গেলেন?"

"হাঁ।"

"এখানে আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা আছে?"

"না। তবে অনেকে গ্রামের লোককে বলেকয়ে এক-আধ রাত থেকে যায়। কেউ-কেউ ছোটকাইয়ে কারও বাড়িতে গিয়েও থাকে। যাদের খুব সাহস, তারা জঙ্গলের ওয়াচ টাওয়ারেও রাত কাটায়।"

"ওয়াচ টাওয়ার কত দূর?"

"এখান থেকে অনেকটা। সব চেয়ে কাছে করদাপাড়া। সেটাও তো প্রায় দশ কিলোমিটার।"

"ওঁরা কি কাল সেখানেই..."

"কে জানে! টুলকায় তো আজ সারাদিন দেখিনি," ছোকরা কর্মচারীটির চোখে জিজ্ঞাসা, "আপনারা কি ওঁদের চেনেন?"

"না। জঙ্গলেই আলাপ হয়েছিল। ওঁরা তা হলে এখানে নেই। তাই তো?"

"থাকলে তো দিনে একবার চোখে পড়ত। তা আপনারা কি এখন ফিরে যাবেন?" পার্থ বলল, "উপায় কী!"

"হেঁটে চারপাশ ঘুরুন না। কাছেই একটা সুন্দর ঝরনা আছে, 'ভীমধারা'। ঝরনার ধারে হরিণটরিনের দেখা মিলতে পারে।"

পথনির্দেশ জেনে নিয়ে হাঁটা ধরল টুপুররা। টুলকা থেকে একটা চড়াই মতো রাস্তা উঠে গিয়েছে উপরে। সেই পথ ধরেই চলেছে চারজন। অল্প একটু গিয়েই বাঁক। ঘুরতেই টুলকা অদৃশ্য, সামনে ফের জঙ্গল। তেমন গভীর না হলেও বেশ গা ছমছমে। হঠাৎই বুমবুম জোরে চেপে ধরেছে টুপুরের হাত। আঙুল তুলে গাছের মগডালে কী যেন দেখাচ্ছে।

চোখ তুলে তাকাতেই টুপুরের হৃৎপিণ্ড ধড়াস। বেজির মতো দেখতে ওটা কী? রক্তের মতো লাল দু'খানা চোখ জ্বলছে যেন! গায়ের রং না লাল, না বাদামি। ইয়া মোটা লেজ। তড়াক-তড়াক লাফ মারছে এ ডাল থেকে ও ডালে।

পার্থরও নজরে পড়েছে। ফিসফিস করে বলল, "ভয় পাস না, ওটা জায়ান্ট স্কুইরেল। সাতকোশিয়ার স্পেশ্যাল।"

প্রাণীটা কাঠবিড়ালি শুনে টুপুর খানিকটা আশ্বস্ত হল বটে, তবু একটা বুক ঢিপঢিপ ভাব যেন রয়েই গেল। চলতে-চলতে সাবধানে দেখছে এদিক-ওদিক। বাঁয়ে পাহাড়ের দিকটায় মাঝে-মাঝে প্রকাণ্ড গর্ত। শুকনো ডালপালায় ঢাকা।

টুপুর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কী?"

"বোধ হয় বাঘটাঘদের স্টোরেজ," পার্থ বেমালুম নির্ভয়ে বলল, "গাঁ থেকে গোরু, ছাগল তুলে আনে তো অনেক সময়। বেশি ভিতরে নিয়ে যায় না। মেরে এখানেই ঢাকা দিয়ে রাখে। পরে সময় সুযোগ মতো এসে পেটে চালান দেয়।"

"তার মানে, কাছাকাছি বাঘ আছে?"

"থাকা অসম্ভব নয়। এই জঙ্গলে যে দু'-চারখানা বাঘ টিকে আছে, তারা নাকি টুলকার দিকেই... আর চিতাবাঘ তো আছেই।"

টুপুরের শরীর হিম হয়ে গেল। বুমবুম কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, "আমি আর যাব না।"

যেতে আর হলও না। অদূরে কাঠের ডান্ডার মাথায় তির চিহ্নে নির্দেশিকা, 'ভীমধারার পথ'।

এ রাস্তাটা তবু মন্দের ভাল। সরু বটে, তবে জঙ্গলটা ছেঁড়া-ছেঁড়া। এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে পাহাড়ের প্রান্তে। সেখানে পৌঁছে টুপুর তো বেজায় হতাশ। শুধু টুপুর কেন, সকলেই। কোথায় গেল ভীমধারা? একটু দূরে পাহাড় থেকে একটা জলস্রোত গড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা নেহাতই ক্ষীণ।

পার্থ বিরক্ত মুখে বলল, "দুর-দুর, আসাটাই বৃথা।"

"চৈত্র মাসে পাহাড়ি ঝরনার চেহারা এরকমই হয়। বর্ষায় এরই রূপ একেবারে বদলে যাবে," মিতিন বাইনোকুলারটা চোখে লাগাল। নিচটা দেখতে-দেখতে বলল, "জায়গাটা কিন্তু ভারী সুন্দর।"

"কী ছিরিটা দেখছ? পাহাড়টা ধাপে-ধাপে নেমে গিয়েছে, নীচে এবড়োখেবড়ো পাথর, সেখানে ডোবা মতো হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, ব্যস।"

"আরও দ্রষ্টব্য আছে," মিতিন বাইনোকুলারটা এগিয়ে দিল পার্থকে, "দ্যাখো তো, আর কিছু চোখে পড়ে কিনা?"

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে পার্থ জোর চমকেছে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, "নীচে তো মানুষ! একটা নয়, দু'টো!"

"হুম। কর্মবীর আর শক্তিধর।"

টুপুরও এবার দেখতে পেয়েছে দু'জনকে। খোলা চোখেই। দু'জনে একটা পাথরের উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে। জলের ধারে।

বিস্মিত মুখে টুপুর বলল, "ওঁরা ওভাবে পড়ে কেন? মরে-টরে গেছেন নাকি?"

"মোটেই না, দিব্যি জ্যান্ত আছেন। নড়ছেন," পার্থ বাইনোকুলারটা মিতিনকে ফেরত দিল। চোখ সরু করে বলল, "ওরা তা হলে এখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে?"

"তাই তো দেখছি," মিতিন ঠোঁট চাপল, "চলো তো, গিয়ে কথা বলি।"

"কথা কিসের? গিয়ে ক্যাঁক করে ধরবে। জঙ্গলে রিভলভার নিয়ে ঘুরছে, এ কি মামদোবাজি পায়া হ্যায়?"

"রিভলভার তো আমার সঙ্গেও আছে পার্থ।"

"তোমার ব্যাপার আলাদা। তুমি প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। রাখতেই পার।"

"ওঁদেরও হয়তো লাইসেন্স আছে," মিতিন মৃদু হাসল, "উত্তেজিত হোয়ো না। চলো, আলাপটা একটু ঝালাই।"

পাহাড়ের গা বেয়ে খাঁজ কাটা-কাটা পায়ে চলার পথ। প্রায় সিঁড়ির মতো। সাবধানে পা ফেলে নামল চারজনে। টুপুরদের দেখেই কর্মবীর আর শক্তিধর উঠে বসেছেন।

ভুরু কুঁচকে শক্তিধর বললেন, "আপনারা হঠাৎ এখানে?"

"আপনাদের পিছু-পিছু এসে পড়লাম আর কী," মিতিন হাসছে। সহজ সুরেই বলল, "বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?"

"রেস্ট নিতে তো জঙ্গলে আসিনি। আমরা দণ্ডীবাট করছি।"

পার্থ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, "সেটা কী?"

"পায়ে হেঁটে সাতকোশিয়া পরিক্রমা। পাক্কা সাঁইত্রিশ কিলোমিটার ঘোরা, সহজ কাজ তো নয়।"

"সে তো বটেই। তার সঙ্গে যদি মাঝে-মাঝে হরিণের পিছু-পিছু ঘুরতে হয়, তা হলে তো কাজটা আরও কঠিন।"

একটু যেন চমকালেন কর্মবীর। পরক্ষণে স্বাভাবিক গলাতেই বললেন, "কঠিন পরিশ্রম না করলে দু' বেলা দু'টো অন্ন জুটবে কী করে মশাই? রাতবিরেতে জঙ্গলে কাটাবার ঝুঁকিই বা কেন নেব?"

"আমারও তো সেই প্রশ্ন। এত ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে চক্কর মারছেন কেন?" পার্থ ফস করে বলে উঠল, "আপনাদের মতলবটা কী?"

"আপনাদের সেবা করা," শক্তিধর বিটকেল সুরে হেসে উঠলেন। মিতিনের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে টুলকা এসেছেন?"

"অবশ্যই," পার্থ জবাব দিল, "আমাদের তো হেঁটে-হেঁটে জঙ্গল চষার শখ নেই। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যও নেই।"

ব্যঙ্গটা যেন গায়েই মাখলেন না শক্তিধর। ফের মিতিনকেই বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই এখন টিকরপাড়াতেই ফিরবেন?"

"লিফ্‌ট চান তো?" মিতিন দু' হাত ছড়িয়ে দিল, "ওয়েলকাম। চলে আসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। দণ্ডীবাট তো মোটামুটি শেষ, টিকরপাড়ায় তাঁবুটার বুকিং এখনও আছে। ভাবছি, আজ টিকরপাড়া ফিরেই যাই।"

ঝোলাঝুলি কাঁধে চাপিয়ে উঠে পড়লেন দু'জনে। টুপুর আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মিতিনমাসির আক্কেলটা কী বুঝে উঠতে পারছে না টুপুর। জেনেশুনে দু'টো সন্দেহজনক লোককে জামাই আদরে নিয়ে যাবে এখন? দিব্যি জঙ্গলের গল্পও জুড়ে দিল দুই মক্কেলের সঙ্গে। তবে কর্মবীর আর শক্তিধরের সঙ্গী হওয়ায় একটা বাঁচোয়া। ফের পাহাড়ে চড়তে হল না, শর্টকাট রাস্তা ধরে সবাই ফিরে এসেছে টুলকায়।

টায়ার সারিয়ে সারথিও প্রস্তুত। বিকেল-বিকেলই রওনা দিল জিপ। বনবাংলোয় এসে কর্মবীর আর শক্তিধর চলে গেলেন তাঁবুর দিকে।

সন্ধে নেমে গিয়েছে। বাংলোর লনে বসে চা আর ভাজাভুজি খাওয়া হচ্ছিল। পাশের বাংলোয় আলো জ্বলছে। বেগুনি খেতে-খেতে পার্থ হঠাৎ বলল, "আমাদের কিন্তু একবার প্রোফেসরসাহেবের কাছে যাওয়া উচিত।"

মিতিন কী যেন ভাবছিল। টক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "ঠিক বলেছ। চলো, ভদ্রলোকের একটা খবর নিয়ে আসি।"

বিভূতি রাতের রান্নায় ব্যস্ত। বুমবুমকে তাঁর জিম্মায় রেখে মিতিনরা গিয়েছে পাশের বাংলোয়। দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই পাল্লা খুলেছে সুবাহু। একটু যেন থমথমে মুখ।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "স্যার এখন কেমন আছেন?"

"ভাল নয়, জ্বরটা বেড়েছে।"

"ও, একবার দেখতে পারি স্যারকে?"

"এখন? ওষুধ খেয়ে মশারির মধ্যে শুয়ে আছেন। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছেন।"

"স্যারকে আজ আর ডিসটার্ব না করাই ভাল," সুবাহুর পিছন থেকে বিট অফিসারের স্বর উড়ে এল, "তা ছাড়া আপনারা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছেন। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে বেশি না যাওয়াটাই নিরাপদ।"

মিতিন বিট অফিসারকে দেখে অবাক যেন। বলল, "আপনি? এই বাংলোয়?"

পূর্ণচন্দ্র আলগা হাসলেন, "আমিই তো ডাক্তারবদ্যির কাজ করছি। জঙ্গলে এসে অনেকেই তো এই অসুখে পড়ে, তাই কিছু মেডিসিন আমাদের কাছে মজুতই থাকে। সেগুলোই দিয়ে গেলাম। কমলে ভাল, নইলে কাল ওঁকে নিয়ে আঙুলে ছুটতে হবে।"

পার্থ সুবাহুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা?"

"চিন্তা করবেন না। পূর্ণবাবু সব কিছুর আয়োজন করে দিচ্ছেন।"

আর কথা না বাড়িয়ে নিজেদের বাংলোয় ফিরল মিতিন, টুপুর আর পার্থ। রুমে এসে মেসোর সঙ্গে গল্প জুড়েছে টুপুর। জঙ্গলের মশা নিয়ে। সকালে নদীতে দেখা ঘড়িয়ালটাকে নিয়ে। টুলকা ভ্রমণ নিয়ে। শক্তিধর আর কর্মবীরকে নিয়ে। টিকড়পাড়া ফেরার পথে কর্মবীর আর শক্তিধর কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন, তাই নিয়েও গবেষণার শেষ নেই দু'জনের। একমাত্র মিতিন চুপ। তার যেন কিছুই কানে যাচ্ছে না। সকালে ফাঁকা তাঁবুতে কুড়িয়ে পাওয়া কার্বন পেপারটা ব্যাগ থেকে বের করে আলোয় মেলে দেখল একটু। তারপর ফের সেটি ব্যাগে চালান করে চলে গেল রান্নার তদারকিতে।

কালই জঙ্গলে শেষ দিন। সকালে বাঘমুন্ডা যাওয়ার প্ল্যান। নৈশাহার সেরে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল সকলে। কোত্থেকে যেন একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। খুবই চেনা গন্ধ। জুঁইফুল? উঁহু। কামিনী? রজনীগন্ধা? নাহ, অনেকটা ল্যাভেন্ডারের মতো লাগে যেন। সাতকোশিয়ার জঙ্গলে কি ল্যাভেন্ডার ফোটে? পাশের বাংলো থেকে আজও ভেসে আসছে গিটারের সুর। কী নেশা রে বাবা! স্যারের অসুখেও গিটার বাজানোয় খামতি নেই।

সুরেলা গিটার আর ফুলের সৌরভে কখন যে চোখ জড়িয়ে এসেছিল টুপুরের। মিতিনমাসি যে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখছে দূরের তাঁবুর আলো, টুপুর টেরও পায়নি।

সকালে ঘুম ভাঙল বুমবুমের চিৎকারে। ঠেলছে টুপুরকে, "অ্যাই ওঠ, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

টুপুর চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বলল, "হলটা কী?"

"খাঁচায় বড় ঘড়িয়াল দু'টো নেই। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম এক্ষুনি।"

॥ ৮ ॥

বাংলোর সামনের লনটায় বিট অফিসার পূর্ণচন্দ্র বেহেরা ঘাড় ঝুলিয়ে বসে। পাশেই সুবাহু। তারও মুখে-চোখে প্রবল বিস্ময়। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা বিভূতিও কেমন থতমত মুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনজনের কারও মুখে বাক্যটি নেই।

পার্থমেসোর সঙ্গে আবার একবার খাঁচাটা দেখে ফিরল টুপুর। ভোরবেলা থেকে এই নিয়ে তিনবার দেখা হল খোলা খাঁচাটা। প্রথমে বুমবুমের সঙ্গে, তারপর মিতিনমাসির পিছু-পিছু। খাঁচায় ঢুকে কত কী যে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করল মিতিনমাসি। আঙুল ঘষে-ঘষে কী যেন পরখ করল খাঁচার মেঝেতে। দেখল, মাছবিহীন ছোট্ট-ছোট্ট জলাশয়গুলোও। তা মাসিও যে এরকম ঘটনায় দারুণ চমকেছে, এতে টুপুরের কোনও সংশয়ই নেই।

পার্থও রীতিমতো উত্তেজিত। রাগ-রাগ গলায় পূর্ণচন্দ্রকে বলল, "আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? ঘড়িয়ালগুলোকে পাহারা দেওয়ার জন্য সিকিওরিটি গার্ড রাখেননি?"

পূর্ণচন্দ্র আমতা-আমতা মুখে বললেন, "না, মানে, রাজুই তো ছিল। রাতবিরেতেও গিয়ে ওদের দেখে আসত। ও হঠাৎ চলে গিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে।"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে। খাঁচার দরজা খোলা পড়ে, কেউ নজর করেনি," পার্থ তেরচা চোখে তাকাল, "ঘড়িয়ালদের খাবারদাবার কে দিচ্ছিল এখন?"

"খাবার মানে তো শুধু জ্যান্ত মাছ। স্থানীয় এক ধীবরকে বলা আছে, সে সাপ্লাই দিয়ে যায় নিয়মিত। রাজুর জায়গায় আমিই এখন ছাঁকনিওয়ালা জালে করে ছেড়ে দিচ্ছিলাম ফিশ পুলে।"

"কালও দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, রাত্রি তখন প্রায় ন'টা বাজে।"

"তখনই বুঝি খাঁচার দরজাটা খুলে রেখে এসেছেন?"

"এমনটা হওয়ার কথা নয়। তবে অনেক সময় তো একটুআধটু ফাঁক থেকে যায়। আর ওরা যে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে...।" পূর্ণচন্দ্র কপাল চাপড়াচ্ছেন, "আর মাত্র তিনটে মাস গেলে কোনও অশান্তিই ছিল না।"

"কেন?"

"ওরা পূর্ণবয়স্ক হয়ে গিয়েছিল তো। এ বছরই বর্ষায় ওদের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হত।"

কথোপকথনের মাঝে মিতিন যেন কখন এসে দাঁড়িয়েছিল পিছনে। ফস করে হালকা সুরে বলল, "তা হলে আর দুশ্চিন্তা করছেন কেন? জলের জীব জলেই চলে গিয়েছে, আপনাদের আর টানাটানির পরিশ্রম করতে হল না।"

"তা বললে কি আমার চলবে ম্যাডাম?" মিয়নো স্বরে বললেন পূর্ণচন্দ্র, "নির্ঘাত শোকজ খেতে হবে।"

"রেঞ্জ অফিসে জানিয়েছেন?"

"অবশ্যই, শুনে তো রেঞ্জারসাহেবের কী চোটপাট!"

"সব দোষ আপনাদের ওই রাজুর। ব্যাটা আমাদের পাঁচশো টাকা নিয়ে কোথায় যে চম্পট দিল," অনেকক্ষণ পর সুবাহু মন্তব্য জুড়ল, "রাজু থাকলে এসব কিছু ঘটত না।"

পার্থ বলে উঠল, "সে তো শুনলাম বাড়ি গিয়েছে।"

"তাই নাকি? আপনাকে কে বলল?"

"লবঙ্গির চৌকিদার। সুরজ মুন্ডা না কী যেন নাম। রাজু নাকি পনেরো দিন পর ফিরবে।"

"আশ্চর্য! আমাকে একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেল না," পূর্ণচন্দ্র ঝেঁঝে উঠলেন, "ফিরুক একবার। ওর চাকরি যদি না আমি খেয়েছি!"

"আহা, অত রেগে যাচ্ছেন কেন? ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে," মিতিন শান্ত করতে চাইল বিট অফিসারকে। স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আচ্ছা পূর্ণবাবু, ঘড়িয়াল দু'টো নদীতে গেল কোন পথে?"

"কেন? খাঁচার দরজা পেরোলেই তো রাস্তা।" সুবাহু আগ বাড়িয়ে জবাব দিল, ঘষটে-ঘষটে আর হাত-দশেক গেলেই পাহাড়কিনার। ওখান থেকে পাথর বেয়ে-বেয়ে নদীতে নেমে যাওয়া কুমিরঘড়িয়ালদের পক্ষে কী এমন কঠিন! বাই দ্য ওয়ে, কাল শেষরাতে আমি ঘড়িয়ালের ডাকও শুনেছি।"

"আপনিও শুনেছেন?" পূর্ণচন্দ্রর চোখ উজ্জ্বল হল, "আমারও কানে এসেছে। তখন বোধ হয় রাত তিনটে সাড়ে-তিনটে হবে। ওই সময়ই বোধ হয় পালিয়েছে।"

"ইস, ওই সময় যদি বেরিয়ে আসতেন, তা হলে বোধ হয় দুই ঘড়িয়ালই ধরা পড়ে যেত," মিতিনের গলায় কৌতুকের সুর, "যাক গে, ওই নিয়ে ভেবে তো আর লাভ নেই। বরং গুছিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করুন। এদিকে আমরাও ব্রেকফাস্ট সেরে বাঘমুন্ডায় বেরিয়ে পড়ি।"

"হ্যাঁ, ঘুরে আসুন। বাঘমুন্ডা খুব ভাল লাগবে। চৌকিদার চক্রধরকে ওখানে গাইড করে নেবেন, আপনাদের ভালভাবে ঘুরিয়ে দেবে।"

বিভূতি রান্নাঘরে চলে গেলেন। সুবাহুও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "আমিও রুমে যাই। সকালে এই ঘড়িয়াল-ঘড়িয়াল করে স্যারের টেম্পারেচারটা দেখা হয়নি।"

সুবাহুর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "জ্বর কমেনি প্রোফেসরসাহেবের?"

"ছাড়ছে, আসছে, ছাড়ছে। স্যার খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারছি না কী করি!"

"হুঁ, প্রবলেম। আপনার তো আজ আর কোথাও বেরনো হচ্ছে না?"

"প্রশ্নই ওঠে না। সারাদিন স্যারের কাছেই থাকব।"

মিতিন রুমে ফিরেছে। পার্থ, টুপুর আর বুমবুমও। ঘরে ঢুকেই মিতিন টুকটাক গোছগাছ করছে। গুনগুন গান গাইতে-গাইতে। টুপুর যেন ঠিক পড়তে পারছিল না মাসিকে। ঘড়িয়ালদের অন্তর্ধান এত সহজে মেনে নিল মিতিনমাসি? এমন একটা কাণ্ড ঘটার পরও ফুরফুরে মেজাজে বেড়াতে বেরোচ্ছে, এ যেন মাসির চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না। টুপুরেরই কি তা হলে ভুল? প্রাণী দু'টোর নিখোঁজ হওয়াটা কি নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার? এতে কি কোনও রহস্যই নেই?

ক্ষুণ্ণ মুখে জলখাবার সারল টুপুর। আজ সাদাসিধে মেনু। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা। খেয়ে উঠে গাড়িতে চাপল সবাই। জিপে স্টার্ট দিচ্ছেন বিভূতি, তখনই টুপুর দেখল, শক্তিধর আর কর্মবীর আসছেন বাংলোর দিকে। কাঁধের ঝোলা ছাড়াই।

টুপুরের মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক। ফিসফিস করে মিতনিকে বলল, "এঁরা আসার পরই কিন্তু কাল ঘড়িয়াল দু'টো হাওয়া হয়েছে।"

"তো?"

"না মানে, একটু ক্রস করে দ্যাখো না। যদি কিছু বের করতে পার।"

"ওঁরা আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কেন?"

"কায়দা করেই না হয় জানবে। এঁরা যে সুবিধের লোক নন, তা তো আমরা আগেই দেখেছি।"

"ওঁদের সঙ্গে ব্যাকব্যাক করার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি কাজ আছে। সময় নষ্ট করাটা এখন উচিত হবে না।"

"এক্ষুনি বাঘমুন্ডা যাওয়াটা এতই জরুরি?"

"আহ, চুপচাপ চল তো।"

অগত্যা টুপুরকে ঠোঁটে কুলুপ আঁটতেই হয়। ওদিকে গাড়ি চলতেই বুমবুমের স্বর ফুটেছে, "ঘড়িয়াল দু'টো কিন্তু খুব মজার ছিল তাই না মা?"

"কেন বল তো?"

"পাশের বাংলোর কাকু এসে দাঁড়ালেই মুখ হাঁ করত।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ গো। আমি কতবার খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মুখ খোলেই না, মুখ খোলেই না। কিন্তু কাকুকে দেখলে ওমনি দু'জনে একসঙ্গে..."

"কাকুকে দেখলেই বোধ হয় ওদের খিদে পেত," পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "এখন অবশ্য দু'জনে মহানন্দে নদীর মাছ সাঁটাচ্ছে সেদার।"

"তাই কি?"

মিতিনের আকস্মিক প্রশ্নে হোঁচট খেয়েছে পার্থ। সে ফের মুখ খোলার আগেই মিতিন বিভূতিকে বলল, "আর এগনোর দরকার নেই। গাড়িটা এবার থামান।"

রাস্তার ধারে জিপ দাঁড় করালেন বিভূতি, "কেন ম্যাডাম? বাঘমুন্ডা যাবেন না?"

"এক্ষুনি নয়। অন্য একটা কাজ মনে পড়ে গেল। টিকরপাড়া বাংলো থেকে আমরা কদ্দূর এসেছি?"

"বড়জোর এক-দেড় কিলোমিটার।"

"আমাদের বাংলোর পিছন দিয়ে যে রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছে, সেখানে কীভাবে পৌঁছনো যায়?"

"গাড়ি তো যাবে না। হাঁটতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।"

"ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, বুমবুমকে নিয়ে পুরানাকোট চলে যান। ভূতবাংলোটার কথা বলছিলেন, ওটা দেখিয়ে আবার ঠিক এই জায়গায় ফিরে আসুন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসবেন, কেমন?"

বুমবুম চোখ পিটপিট করল, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"বাঘ খুঁজতে। যাবি তুই?"

বুমবুম জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "না। কিন্তু একা-একা ভূতের বাড়ি!"

"ভয় করছে?"

"হ্যাঁ," বুমবুম করুণ মুখে পার্থকে বলল, "বাবা, তুমিও চলো না।"

দলছাড়া হতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না পার্থর। মিতিন যে কিছু একটা করতে চলেছে, সে তো টের পেয়েই গিয়েছে। কিন্তু ছেলের আবদারও তো উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

পার্থ-বুমবুমকে নিয়ে চলে গেল বিভূতির জিপ। তরতরিয়ে ডান দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল মিতিন। টুপুরকে সঙ্গে নিয়ে। শাল, সেগুন, শিশু, গামারের ছায়াঢাকা শুনশান অরণ্য। পায়ের নীচে শুকনো পাতা ভাঙছে খড়মড়। নিস্তব্ধ বনে ওই আওয়াজটুকুই যে কী কানে লাগে! গাছগাছালি তেমন একটা ঘন নয়, তবু প্রতি মুহূর্তে বুক টিপটিপ। মনে হয়, এই বুঝি এসে পড়ল কোনও বুনো জন্তু!

কিছু বলব না, বলব না করেও টুপুর জিজ্ঞেস করে ফেলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি মিতিনমাসি?"

মিতিনের কাঠ-কাঠ জবাব, "আশা করি, এটুকু আন্দাজ করার মতো বুদ্ধি তোর আছে।"

"বাংলোর পিছনের জঙ্গলটায়? কিন্তু কেন?"

"ছেঁড়া-ছেঁড়া সুতোগুলো জুড়তে।"

"মানে?"

"কথা না বলে জোরে পা চালা। আমার হিসেবমতো এখন অনেকটা হাঁটতে হবে।"

ছমছমে অরণ্য চিরে আরও মিনিট দশেক চলার পর একটা মেঠো রাস্তায় এসেছে দু'জনে। বনপথই, তবে মোটামুটি চওড়া। বোঝা যায়, এদিক দিয়ে মানুষ আসা-যাওয়া করে রোজ।

মিতিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ঘোরাল। তারপর একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "আমাদের বাংলোটা পুবে। সুতরাং এখন পশ্চিমে হাঁটতে হবে।"

"কেন?"

"ফের প্রশ্ন? স্টার্ট ওয়াকিং।"

বোধ হয় একশো মিটারও এগোয়নি, জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে শুরু করেছে। রাস্তাটাও এবার পাহাড়ি, পাকদণ্ডীর মতো। চড়াই বেয়ে উঠতে-উঠতে টুপুরের গা ছমছম ভাবটা বেড়ে যাচ্ছিল যেন।

হঠাৎ থমকেছে মিতিন। পরক্ষণেই দৌড়ে গিয়ে একটা পলিথিনের খালি বস্তা কুড়োল জঙ্গল থেকে। আঙুলে তুলে শুঁকল একটু। তারপর আলগোছে জিভে ছোঁয়াল আঙুলটা।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী গো?"

"নুন।"

"জঙ্গলে নুনের বস্তা?"

"হুম। এটা না থাকলে হিসেব মেলে না। মনে হচ্ছে, গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছি।"

বস্তাটা ভাঁজ করে নিয়ে এগোল মিতিন। ছোট্ট একটা বাঁক ঘুরে ফের রুদ্ধ হয়েছে তার গতি। পথের ধারে একটা বড়সড় গর্ত। অনেকটা টুলকায় যেমন দেখেছে।

ঝুঁকে গর্তটা পর্যবেক্ষণ করল মিতিন। দেখছিল টুপুরও। বলল, "ভিতরে তো কিছু নেই গো।"

"ভাল করে লক্ষ কর। আছে। রাশি-রাশি পিঁপড়ে।"

"তাই তো! এত পিঁপড়ে কেন?"

"ওদের খাদ্যবস্তু যে ছিল এখানে।"

"কোনও মরা জন্তুটন্তু?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন উবু হয়ে বসেছে। হাত বাড়িয়ে গর্ত থেকে একটা দড়ি টানল। দড়ির সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আসছে একটা ভাঙাচোরা কাঠের পাটাতন। চার-চারখানা চাকা লাগানো।

পাটাতনটাকে নেড়েচেড়ে দেখল মিতিন। তারপর একটা পাতলা হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। মাথা দোলাতে-দোলাতে বলল, "সব হিসেবই মিলে যাচ্ছে রে।"

"কিসের হিসেব?" টুপুরের ভুরুতে ভাঁজ, "তুমি ঘড়িয়াল অন্তর্ধানের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছ বুঝি?"

"গুড গেস," টুপুরের পিঠে আলগা চাপড় দিল মিতিন। হালকা চালে বলল, "চল, অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ। এবার ফিরি।"

মিতিনের পাশাপাশি হাঁটছিল টুপুর। যেতে-যেতে বলল, "কাল রাত্তিরে ঘড়িয়াল দু'টো চুরি করে এখানেই মারা হয়েছিল। তাই তো?"

"যা মনে আসে বলে যা। শুনছি।"

"তারপর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে চোররা। মাংসটা গর্তে ফেলা হয়েছিল, জন্তুজানোয়ার এসে খেয়ে গিয়েছে," বলেই টুপুরের খটকা লেগেছে। ভুরু কুঁচকে বলল, "তা হলে হাড়গোড়গুলো গেল কোথায়? সেগুলোও কি সাবাড় হয়ে গিয়েছে?"

"তুইই বল।"

টুপুর মগজ হাতড়াল। জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, "হয়তো গর্তে নেই। হয়তো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আর একটু খুঁজলে হয়তো মিলত।"

"ঘোড়ার ডিম," মিতিন এক ফুঁয়ে টুপুরের ধারণাটা উড়িয়ে দিল, "আর কী মনে হচ্ছে বল?"

"ঘড়িয়ালের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল শেষরাতে। তখনই কিংবা তারপর নিশ্চয়ই চুরিটা হয়েছে।"

"অর্থাৎ তিনটে-চারটের সময়। তারপর মাত্র ঘণ্টা ছ'য়েক গড়িয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে দু'-দু'টো ঘড়িয়ালের মাংস কি কোনও জন্তুর পক্ষে চেটেপুটে খেয়ে ফেলা সম্ভব?"

"তাও তো বটে। তা হলে?"

"ভাব, ভাব। ভাবা প্র্যাক্টিস কর। কানে যা শুনবি, সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিস না। তোর কি ধারণা, ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে ওই পাটাতনে চাপিয়ে এতটা দূর পর্যন্ত আনা হয়েছিল? এক-একটা ঘড়িয়ালের ওজন জানিস? অন্তত দেড়শো কেজি। তার উপর অতটা লম্বা, অন্তত বারো-চোদ্দো ফুট।"

টুপুর ভাবনায় পড়ে গেল। এ তো বেশ জটিল ধাঁধা!

॥ ৯ ॥

পুরানাকোট বেড়িয়ে এসে যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল বিভূতির জিপ। তারপর বাঘমুন্ডা ঘুরে ফিরতে-ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। তিন পাহাড়ে ঘেরা গহন জঙ্গল দেখে সকলেই খুশি। কিন্তু বেলা এতই গড়িয়েছে, খিদেয় সকলের পেট চুঁইচুঁই। ভাগ্যিস পার্থ বুদ্ধি করে একছড়া কলা নিয়েছিল সঙ্গে। তাই খেয়ে কোনওক্রমে পিত্তরক্ষা হয়েছিল। ফিরে বাংলোর হাতায় গাড়ি রেখে বিভূতি চললেন রান্না বসাতে। ঘি সহযোগে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, ভাত আজ দুপুরের মেনু।

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বিট অফিসার এসে উপস্থিত। সকালের শুকনো ভাবটা আর নেই। খুশি-খুশি মুখে পূর্ণচন্দ্র জানালেন, "আমাদের রেঞ্জ অফিসার এসেছিলেন ম্যাডাম। চাকরিটা আমার বেঁচে গেল। সব দেখেশুনে তিনি আমায় ক্লিনচিট দিয়েছেন।"

টুপুরকে অবাক করে মিতিনও হাসল, "বাহ বাহ, এ তো সত্যিই গুড নিউজ। ঘড়িয়াল দু'টো তা হলে নদীতেই চলে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। স্যারেরও তাই মত। তবে খাঁচা খালি থাকবে না। কপিলাসেও আমাদের ঘড়িয়াল প্রকল্প আছে। ওখান থেকে দু'-তিনটে ছানা ঘড়িয়াল আনাবেন কয়েকদিনের মধ্যেই।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। এবার আপনাকে একটা সুসংবাদ দিই?" বাঘমুন্ডার চৌকিদার চক্রধর বলল, "ওর সঙ্গে নাকি কাল দেখা হয়েছিল রাজুর, আঙুলে। রাজু তো আঙুলের কাছেই কোনও একটা গ্রামে থাকে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ডাঙ্গরিতে," পূর্ণচন্দ্রর কপালে পলকা ভাঁজ, "চক্রধরের সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে রাজুর? মানে কবে সে ফিরছে?"

"সেই খবরই তো দিচ্ছি। রাজুর নাকি বাড়ির কাজ মিটে গিয়েছে। আগামীকালই চলে আসবে," মিতিনের হাসি চওড়া হল, "এটাও তো সুসমাচার, নয় কি?" সুবাহু আর প্রোফেসরসাহেবের আর খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে থাকবে না। আপনারও ঘড়িয়ালদের দেখভাল করার ঝক্কি থেকে মুক্তি।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," ফের মুখে উচ্ছ্বাস ফিরেছে পূর্ণচন্দ্রর। মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনাদের আজ বিকেলে কী প্রোগ্রাম?"

"আজ আর কোথাও যাব না। ক'দিন জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে খুব টায়ার্ড। ভাবছি, পিছনের জঙ্গলটায় একটু ঘোরাফেরা করব।"

পূর্ণচন্দ্র হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "সাবধান, বেশি দূরে যাবেন না যেন।"

"কেন?"

"কাল রাত্তিরে বেলিং হচ্ছিল যে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "সেটা আবার কী?"

"শম্বর হরিণের ডাক। অবিকল ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনায় বলে ওই নাম। কোনও হিংস্র জন্তু কাছাকাছি এলে ওরা ওই ডাকটা ছাড়ে। জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের সাবধান করার জন্য।"

"অর্থাৎ, বাঘটাঘ গোছের কিছু একটা এসেছিল?"

"হয়তো এখনও রয়েছে। তক্কে-তক্কে ঘুরছে। খুব চালাক প্রাণী তো, শিকার না পেলে সহজে নড়তে চায় না। আপনাদের সঙ্গে বাচ্চাটাচ্চা আছে, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি।"

"থ্যাঙ্কস," মিতিন বলে উঠল, "আমাদেরও অ্যাডভেঞ্চারের শখ নেই। বন দেখা হল, নৌকোয় চড়লাম, এই তো যথেষ্ট। আজ রাত্তিরে চটপট শুয়ে পড়ব। লম্বা একটা ঘুম দিয়ে কাল সকালে প্রস্থান।"

"সেই ভাল। শরীর ফ্রেশ থাকবে। চাইলে ফেরার পথে একবার কপিলাসও ঘুরে যেতে পারেন। চমৎকার একটা লেক আছে, ছোটখাটো পাহাড়ও আপনাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"

"দেখি কী করা যায়।"

চলে গেলেন পূর্ণচন্দ্র। টুপুররা রুমে এল। মনটা খচখচ করছিল টুপুরের। ঘড়িয়াল দু'টোর জলে চলে যাওয়ার তত্ত্বটাই মেনে নিল মিতিনমাসি? তা হলে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে অত সব অনুসন্ধানের কী অর্থ? বাঘমুন্ডার বাংলোয় চৌকিদারের সঙ্গে মিতিনমাসি আলাদা কথা বলছিল বটে, কিন্তু রাজু যে কালই ফিরছে এ কথাটা তো একবারও বলল না? জঙ্গলে ঢুকে মাসি-বোনঝি কী করছিল তা জানতে কত খোঁচাল পার্থমেসো, কোনও উচ্চবাচ্যই করল না মিতিনমাসি। দেখাদেখি টুপুরকেও চুপ মেরে থাকতে হল।

নাহ, সত্যিই মিতিনমাসির মনের তল পাওয়া ভার। খেয়েদেয়ে সেই যে বিছানায় চোখ বুজে শুল, আর ওঠেই না। ডেকে-ডেকে হতাশ হয়ে বুমবুমকে নিয়ে পার্থমেসোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল টুপুর। হাঁটতে-হাঁটতে নদীর ধারে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! কর্মবীর, শক্তিধর তো বেপাত্তাই, তাঁদের তাঁবুটাও আর নেই। বাংলোয় ফিরে পূর্ণচন্দ্রর মুখে শুনল, তাঁরা নাকি সকালেই চেক আউট করে বেরিয়ে গিয়েছেন।

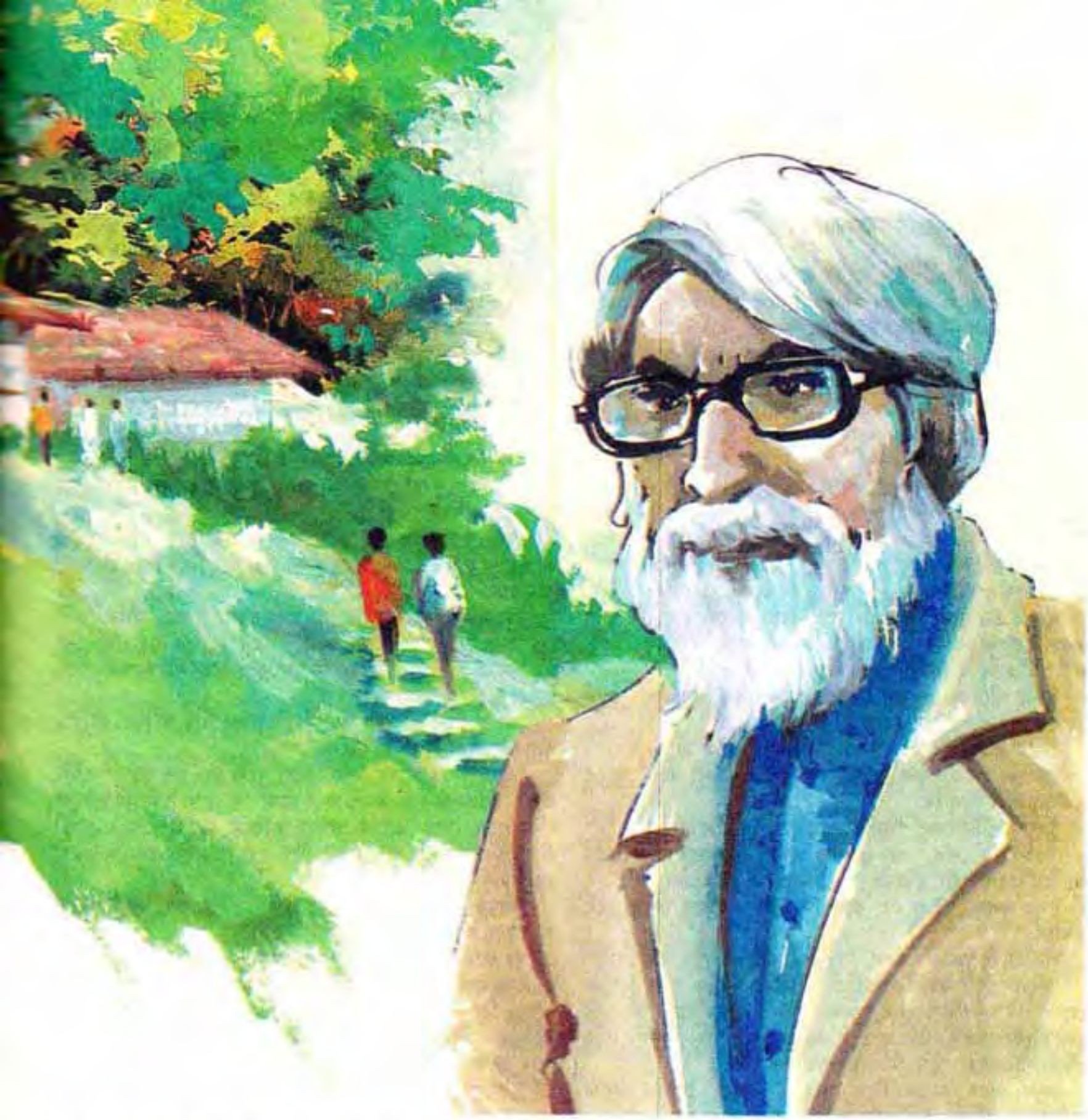

সম্ভবত আঙুলগামী বাসে চড়ে। সংবাদটা মিতিনমাসিকে দেওয়ার পরও তার কোনও হেলদোল নেই। একবার প্রোফেসারসাহেবকে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়ল পার্থমেসো। মিতিনমাসি গা-ই করল না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মিতিন আমূল বদলে গিয়েছে। বুমবুম ঘুমোতেই আলস্য ঝেড়ে ফেলে থমথমে মুখে পায়চারি করছে ঘরে। টুপুর আর পার্থকে রুমে থাকতে বলে আচমকাই কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। তারপর আর ফেরেই না, ফেরেই না। এগারোটা বাজল, সাড়ে এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল। পার্থমেসো তো রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বলল, "কী রে, এবার কী করা যায়?"

টুপুর বলল, "বিট অফিসারকে খবর দেবে? একা-একা যদি জঙ্গলে ঢুকে থাকে, যদি বিপদ-আপদ হয়!"

"নাকি বিভূতিবাবুকে ডাকব? উনি তো জঙ্গলটা চেনেন, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে, সঙ্গে জোরাল টর্চটাও থাকবে..."

"কিন্তু মিতিনমাসি যে বেরোতে বারণ করে গিয়েছে?"

"তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? জঙ্গলে বাঘ-চিতা ঘোরাফেরা করছে জানার পরও?" পার্থমেসো মাথা ঝাঁকাচ্ছে, "উফ, তোর মাসিটা যে কী করে না!"

ঠিক তখনই দরজায় টকটক। দৌড়ে গিয়ে পাল্লা খুলতেই মিতিনমাসি। ঠোঁটে আঙুল চেপে সুড়ুৎ করে ঢুকে এল অন্দরে। একদম নিচু গলায় বলল, "যা বলছি, চুপচাপ শোন। তোরা দু'জনে ঘড়িয়ালের খাঁচাটার ওখানে চলে যা। একসঙ্গে নয়। আগে তোর মেসো, তারপর তুই। খাঁচার ধার দিয়ে একটা রাস্তা উঠে গিয়েছে জঙ্গলে। ওই রাস্তা ধরে উপরে ওঠ। তারপর বাঁয়ে ঘুরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাংলো দু'টোর ঠিক পিছনটায় আয়।"

"আর তুমি?"

"আহ, প্রশ্ন নয়। যা বলছি কর। আর হ্যাঁ, উপরে জঙ্গলেই থাকবি, নীচে নামবি না। সঙ্গে টর্চ নেওয়ার দরকার নেই। বরং আমার বায়নোকুলারটা রাখ। ওটা দিয়ে রাজুর কোয়ার্টারটাকে ওয়াচ করবি।"

"কেন?"

"ফের প্রশ্ন? শুধু খেয়াল রাখবি, গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ যেন না বের হয়।"

বলেই মিতিন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। একটুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল টুপুর আর পার্থ। তারপর বাইরে এসে তাকাল এদিক-ওদিক। না, মিতিন নেই। হুস করে কোথায় যে উবে গেল! কিন্তু তার নির্দেশ তো পালন করতেই হবে। পা টিপে-টিপে লন পেরিয়ে খাঁচার কাছে গেল পার্থ। একটু অপেক্ষা করে টুপুরও। যেতে-যেতে একবার দেখল বিট অফিসারের কোয়ার্টারটা। নিঝুম, অন্ধকার। পূর্ণচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

আঁধার বড্ড গাঢ়। খাঁচার ধারের পায়ে চলা রাস্তাটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। আন্দাজে-আন্দাজে সাবধানি পায়ে উঠছিল টুপুর। সামনে পার্থ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফিট চড়াইয়ের পর অবশেষে সমতল। এবার শুকনো পাতা মাড়িয়ে এক পা, এক পা করে বাঁয়ে। পাতা ভাঙার খড়মড়ে আওয়াজে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াস-ধড়াস। মিতিনের বলে দেওয়া জায়গাটায় যখন পৌঁছল, টুপুর হাঁপাচ্ছে রীতিমতো।

দু'খানা বাংলোই ঢেকে আছে আবছায়ায়। বিষাক্ত পোকামাকড় রুখতে জানলা সব বন্ধ, ভিতর থেকে একটুও আলো আসছে না। রাজুর কোয়ার্টার তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রাতচরা পাখিদের নানারকম ডাক শোনা যায়। খলখল। খ্যাঁচখ্যাঁচ। ঠকঠক। কোথায় যেন একটা শিয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা শিয়াল। আবার একটা। তারপর কোরাসে হুক্কাহুয়া ধ্বনি। একটু পরে থামল শিয়ালের পাল। ঘোর নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের রেশটা যেন রয়ে গেল কানে।

হঠাৎই এক সুরেলা আওয়াজ গিটারের। সুবাহুদের বাংলো থেকে। একটা ইংরিজি গানের সুর বাজাচ্ছে সুবাহু। অবাক হল টুপুর। রাত গভীর না হলে কি গিটার বাজায় না সুবাহু?

মিনিট পাঁচেকও কাটেনি, টুপুরের কানে পার্থর ফিসফিস, "অ্যাই টুপুর, রাজুর কোয়ার্টারের সামনে কে যেন এসেছে!"

চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে চমকাল টুপুর। ও মা, তাই তো! কোয়ার্টারের দোরগোড়ায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে! কী কাণ্ড, আরও একজন এসে গেল যে!

টুপুরের ঠোঁট নড়ল, "কর্মবীর আর শক্তিধর মনে হচ্ছে।"

"কই দেখি, দেখি," পার্থ প্রায় কেড়ে নিল বাইনোকুলারটা। চোখে লাগিয়ে বলল, "হ্যাঁ, দু'জনই তো। নির্ঘাত ওই দুই মক্কেল।"

টুপুর বলল, "ওঁরা তো চলে গিয়েছেন? আবার ফিরে এসে ওখানে?"

পার্থ উত্তেজিতভাবে বলল, "দরজা খুলেছে! ভিতরে ঢুকে গেল।"

আলো জ্বলে উঠল কোয়ার্টারের। মিনিট দু'য়েক পরে নিভেও গেল। পার্থ চাপা স্বরে বলল, "এবার দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে কাঁধে কী যেন নিয়ে। বড়সড় বস্তার মতো," বলতে-বলতে বাইনোকুলার চোখ থেকে নামিয়েছে, "ধুস, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।"

টুপুর গালে আঙুল দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার। ইস, মিতিনমাসিটা যে এখন কোথায় গেল!"

"আমি তোদের সঙ্গেই আছি রে," টুপুরের কাঁধে হঠাৎ মিতিনের হাত। মৃদু স্বরে মিতিন বলল, "চল, কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার নামা যাক।"

"কী কাজ?"

"ঘড়িয়াল চোর ধরা।"

"কর্মবীর আর শক্তিধর?" পার্থ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও গলা নামাল, "কিন্তু ওরা তো পালিয়ে গেল।"

"চোর-ডাকাতরা কি আমাকে ফাঁকি দিয়ে অত সহজে পালাতে পারে?" মিতিনের স্বর শীতল, "এসো আমার সঙ্গে।"

বলেই অন্ধকারে তরতরিয়ে নামতে শুরু করল মিতিন। পার হল রাজুর কোয়ার্টার। তারপর আচমকাই ঘুরে সুবাহুদের বাংলোয়।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "এখানে কেন? কর্মবীর আর শক্তিধরকে কি এখানে পাবে?"

"আহ, প্রশ্ন করিস কেন? মজাটা দ্যাখ।"

দরজায় করাঘাত করল মিতিন। অন্দরে গিটারের আওয়াজটা থামল। সুবাহুর স্বর উড়ে এল, "কে?"

"আমি, মানে পাশের বাংলোর।"

মিনিটখানেক কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলেছে সুবাহু। এত রাতে মিতিনদের দেখে বিস্মিত যেন। বলল, "আপনারা? এখন?"

"কাল সকালবেলা বেরিয়ে যাব তো, ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। আপনি গিটার বাজাচ্ছিলেন, ভাবলাম জেগে আছেন," মিতিন হাসল, "প্রোফেসরসাহেব এখন কেমন? জ্বর নেমেছে?"

"একটু আছে এখনও।"

"এবার পুরোপুরি ছেড়ে যাবে," মিতিন মুচকি হাসল, "আমাদের ভিতরে আসতে বলবেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসুন, আসুন।"

অন্দরে পা রেখে মিতিন তাকাল এদিক-ওদিক, "আপনার গিটারটা দেখছি না যে? স্যারের রুমে রেখে এলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"নিয়ে আসুন না। একটু বাজান, শুনি।"

"না, না," সুবাহু যেন লজ্জা পেল, "তার চেয়ে বরং আপনাদের সঙ্গে খানিক গল্পই করি।"

"গল্প করতে-করতেই নয় শুনব। বাজানোর পরিশ্রমটুকুও আপনাকে করতে হবে না। শুধু একবার ও ঘরে গিয়ে সিডি প্লেয়ারটা আবার চালিয়ে দিন।"

সুবাহুর মুখ পলকে ফ্যাকাসে। থতমতভাবে বলল, "মানে?"

"আশ্চর্য! আমার সোজা কথাটার মানে বুঝলেন না?" মিতিনের স্বর সামান্য রুক্ষ হল, "এখনও কি বুঝতে পারছেন না, আপনার খেল খতম। থুড়ি, আপনাদের।"

"কী বলছেন আবোল তাবোল?" সুবাহু কাঁধ ঝাঁকাল। বিস্মিত গলায় বলল, "কী খেল? কিসের খেল?"

"একটা নয়, অনেক, লম্বা লিস্টে যাচ্ছি না। শুধু বড় খেলাটাই বলি।" মিতিনের গলা ক্রমশ কড়া হচ্ছে, "দু'-দু'খানা নিরীহ দুষ্প্রাপ্য ঘড়িয়ালকে মেরে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে বাক্সবন্দি করে চম্পট দেওয়ার বন্দোবস্তটি পাকা। এটা কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছে। আর তো আপনাদের রেহাই নেই।"

"থামুন তো," সুবাহু তেড়ে উঠল, "কী সব উলটোপালটা অভিযোগ আনছেন? জানেন আমরা কে?"

খুব জানি। বেআইনি পশু-চামড়া চালানের যে আন্তর্জাতিক চক্রটি ভারতের জঙ্গলে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে, আপনারা তাদেরই দুই পান্ডা। রিসেন্টলি সুন্দরবনে একটা সাকসেসফুল অপারেশন করে এসেছেন। এখানেও যেভাবে ঘুঁটি সাজিয়ে ধাপে-ধাপে এগিয়েছিলেন, কাজ হাসিল করে নির্বিবাদে পালিয়ে যেতে পারতেন," মিতিনের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল, "কিন্তু আপনাদের কপাল খারাপ। এই সময়েই আমি বেড়াতে এলাম কিনা। আর আমার পাল্লায় পড়লে আপনাদের মতো ক্রিমিনালদের শ্রীঘর বাস তো অনিবার্য।"

"এই যে, আপনি বেরোন তো এখান থেকে। আউট। আউট," সুবাহু প্রায় গর্জন করে উঠল, "যত্ত সব ফালতু লোকজন! মাঝরাত্তিরে অন্য টুরিস্টদের বাংলোয় এসে হল্লা জুড়েছেন, আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। মানে-মানে কেটে পড়ুন তো।"

"এখনও তেজ কমেনি, অ্যাঁ?" মিতিনও পালটা গলা চড়াল, "যাব নাকি পাশের ঘরে? এখনও নিশ্চয়ই ফলস গিটারের বাক্সটায় চামড়া ভরে উঠতে পারেননি? তা ছাড়া স্কেলিটন দু'টোও তো এখনও রাজুর কোয়ার্টারে পড়ে!"

কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, পাশের ঘর থেকে হঠাৎই ইন্দ্রজিৎ সেনের উদয়। না, কোনও অসুস্থ বয়স্ক প্রোফেসর নয়, দিব্যি এক তাগড়াই জোয়ান। নকল দাড়িগোঁফ উধাও, চোখে চশমাও নেই, হাতে উদ্যত রিভলভার।

চিবিয়ে-চিবিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, "আপনি বড় বেশি জেনে ফেলেছেন। আপনাদের কাউকেই তো আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না।"

"মেরেই ফেলুন তা হলে," মিতিনের কোনও তাপ উত্তাপ নেই।

বাঁকা সুরে বলল, "তারপর বেঁচে বেরোতে পারবেন তো? পেরোতে পারবেন পম্পাসার চেকপোস্ট?"

"এই না হলে মেয়ে টিকটিকির বুদ্ধি! আমরা ওই পথে যাবই না। রিভলভারের নলটা একবার টুপুরকে তাক করল। ইন্দ্রজিৎ পরক্ষণে নল ঘুরিয়েছে পার্থর দিকে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে ম্যাডাম। নদীপথে গিয়ে ওপারে চামুণ্ডিয়ায় নামব। তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না।"

"কিন্তু নৌকোটা যে আর নেই। মাঝিসুদ্ধ নৌকো আমি ভাগিয়ে দিয়ে এসেছি।"

"কী? কী বললেন?" ইন্দ্রজিতের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। রিভলভারের নল মিতিনের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "প্রথম গুলিটা তো তা হলে আপনার কপালেই নাচছে। তারপর ওই দু'টোকে ফিনিশ করে লাশগুলোকে ভাসিয়ে দেব নদীতে। আর কোনও প্রমাণই থাকবে না।"

খচ করে একটা শব্দ হল সেফটি ক্যাচ তোলার। পরক্ষণেই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটাল মিতিন। বিদ্যুৎবেগে জিন্সের পকেট থেকে বের করেছে রিভলভার। ইন্দ্রজিৎকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে সরাসরি গুলি করেছে তার হাতে। ছিটকে গেল ইন্দ্রজিতের অস্ত্র। কঁকিয়ে যন্ত্রণায়।

মিতিন গম্ভীর গলায় বলল, "আমার দিকে রিভলভার তোলাটা আমি একটুও পছন্দ করি না। আশা করি, এবার আপনারা সারেন্ডার করবেন।"

বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন কর্মবীর আর শক্তিধর। রিভলভার হাতে মিতিনকে দেখে বললেন, "ও, আপনি একাই দুই বজ্জাতকে সামলে নিয়েছেন?"

"এবার তিন নম্বরটিকে আপনারা পাকড়াও করুন। সে বেচারা ও ঘরে বসে-বসে ঘামছে।"

বিট অফিসার পূর্ণচন্দ্র বেহেরাকে ঘেঁটি ধরে বের করে আনলেন কর্মবীর। নাইলনের দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হল তিনজনকে।

গোটা দৃশ্যটাই কেমন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল টুপুরের। শুধু বুঝতে পারছিল না, সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে।

॥ ১০ ॥

ওফ, রাত একখানা গেল বটে! পুরানাকোট থেকে জিপ হাঁকিয়ে চলে এলেন রেঞ্জারসাহেব। আঙুল থেকে গাড়িভর্তি পুলিশও হাজির। ডোরাই মালপত্র সমেত তিন অপরাধীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের গাড়ি যখন রওনা দিল, সাতকোশিয়ার জঙ্গলে তখন ভোরের আভাস। পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। পুব আকাশে লাগছে রঙের ছোঁয়া।

এরকম একটা রোমহর্ষক রাতের পর আর কি বিছানায় যেতে মন চায়? ঘুম তো উবেই গিয়েছে টুপুরের চোখ থেকে। পার্থ আর মিতিনের সঙ্গে সে বসে আছে বাংলোর লনে। চেয়ার পেতে। ফুরফুরে প্রভাতী হাওয়া খাচ্ছে।

বিভূতি চা নিয়ে এলেন। মাঝরাতে হল্লাগুল্লার আওয়াজে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিলেন তিনি। তারপর থেকে গোল-গোল চোখে দেখছেন সব কিছু। শ্রদ্ধামিশ্রিত স্বরে মিতিনকে বললেন, "ম্যাডাম, আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন।"

"এবার আপনি কামাল করুন। জঙ্গলের শেষ ব্রেকফাস্টটা জমিয়ে বানান তো। বেশ মোটা মোটা আলুর পরোটা। যা এখন অনেকক্ষণ পেটে থাকবে। পারবেন?"

ঢক করে ঘাড় নাড়লেন বিভূতি। হাসি-হাসি মুখে বললেন, "ওই দুই বাবুও কি আসবেন? ওঁদের জন্যও বানাব?"

"না, না। ওঁরা তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। রেঞ্জারসাহেবের সঙ্গে চলে গিয়েছেন। উনিই ওঁদের ফেরার ব্যবস্থা করবেন।"

বিভূতি রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই টুপুর লজ্জা-লজ্জা মুখে বলল, "কর্মবীর আর শক্তিধরবাবুকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আন্দাজই করতে পারিনি ওঁরা বনবিভাগের বিশেষ সুরক্ষা বাহিনীর অফিসার। চোরাশিকারি ধরতে হানা দিয়েছিলেন সাতকোশিয়ায়।"

পার্থ বলে উঠল, "ওঁদের ফোটোটাই তো আরও গন্ডগোল পাকিয়ে দিল। জঙ্গলে রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন, পোচার ছাড়া আর কী ভাবব?"

মিতিন বলল, "দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করতে জানলে ফোটোর রিভলভার থেকেই ওঁদের সঠিক পরিচয় পেয়ে যেতে।"

"কী বিশেষত্ব ছিল?"

"ওগুলো সার্ভিস রিভলবার মশাই। শুধু সরকারি বাহিনীই ওই রিভলভার ব্যবহার করে। তা ছাড়া জঙ্গল ভেদ করে পাঁচ ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার যাওয়া মোটেই চোরাশিকারিদের কম্মো নয়। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ লাগে।"

"অ। তুমি বুঝি তাই দিয়েই দু'য়ে-দু'য়ে চার করেছিলে?"

"উঁহু। পৌনে চার। বাকিটুকু নিশ্চিত হলাম কার্বন পেপারটা থেকে। ডে টু ডে রিপোর্ট লিখে রাখছিলেন ওঁরা সরকারি বয়ানে। কার্বন পেপারটা আলোয় ধরতে স্পষ্ট পড়া গেল। ওই রিপোর্ট থেকেই জানলাম, জঙ্গলে চোরাশিকারি ঢুকেছে এমন একটা ইনফরমেশান পেয়েই ওঁরা হাজির হয়েছিলেন সাতকোশিয়ায়। তবে ওঁরা ভেবেছিলেন, বাঘ, হাতি, কিংবা হরিণটরিন কিছু মারা হবে। আসল টার্গেট যে ঘড়িয়াল, এটা ওঁদের হিসেবেই ছিল না।"

"তুমি আন্দাজটা করলে কী করে? ঘড়িয়াল দু'টো নিখোঁজ হল তাই?"

"আজ্ঞে না স্যার। এখানে পা রাখার পরদিন থেকেই আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল চলছে। চৌকিদার উধাও, কথাটা পম্পাসার চেকপোস্ট পর্যন্ত রটে গিয়েছে, অথচ বিট অফিসারের মোটেও তেমন হেলদোল নেই। আবার ওদিকে লবঙ্গির সুরজ মুন্ডা জানে, রাজু দু' সপ্তাহ ছুটিতে গিয়েছে। এটা কেমন করে সম্ভব?"

"অর্থাৎ বিট অফিসারই ওকে ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাই তো?"

"ইয়েস মাই ডিয়ার ওয়াটসন," টুপুরকে ছোট্ট একটা তারিফ ছুড়ল মিতিন, "বাসে যাওয়ার পথে কাউকে হয়তো বলেছিল রাজু। সেটাই পৌঁছে গিয়েছে সুরজ মুন্ডার কানে। তখনই মনে হল, ধোঁয়া ছাড়া তো আগুন হয় না। সুতরাং রাজুকে বাড়ি পাঠানোর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। তার আগেই রাজুর কোয়ার্টারের সামনে ক্রোমিয়াম সালফেটের গুঁড়ো পেয়েছি। দু'য়ে মিলে গাঢ় হল সংশয়টা।"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বটে," টুপুর বলল, "কিন্তু ক্রোমিয়াম সালফেটে কী হয়?"

পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "মারাত্মক কোনও বিষটিস হবে। জন্তুজানোয়ার মারতে বোধ হয় কাজে লাগে।"

"তোমার জিকের ফান্ডা দিন-দিন কমে যাচ্ছে," মিতিন পলকা ঠাট্টার সুরে বলল, "জন্তুজানোয়ারের কাঁচা চামড়া জলদি-জলদি শুকোতে ওই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার হয় দুনিয়াভর। তখনই মনে হল, ওই কাজে কোয়ার্টারটিকে লাগানোর জন্যই সম্ভবত ভাগানো হয়েছে রাজুকে। সঙ্গে অবশ্য নুনও লাগে। তারও খালি বস্তা তো আমরা পেয়েছি।"

"বুঝলাম," টুপুর মাথা দোলাল, "ওই মতলব থেকেই শেষরাতে গিয়ে ওরা মারল ঘড়িয়াল দু'টোকে। তারপর তিনজনে মিলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জঙ্গলে। সুবাহুদের বাংলোর ভিতরের ঘরটায় যে ভোঁতা-ভোঁতা ছুরিগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো দিয়েই ছাল ছাড়িয়ে মাংস ফেলে দিল গর্তে। আর পাটাতনে চাপিয়ে চামড়া ও কঙ্কালটা নিয়ে এল রাজুর কোয়ার্টারে।"

মিতিন ভুরু নাচাল, "তা হলে পাটাতনটা জঙ্গলের গর্তে পাওয়া গেল কেন?"

"সুবাহুরা আবার ফেলে দিয়ে এসেছিল।"

"তোর মুন্ডু, ঘড়িয়ালের মাংসই বা গেল কোথায়? তোকে কালই বললাম না, কোনও জন্তুর পক্ষে দু' ঘণ্টায় অতখানি মাংস খাওয়া সম্ভব নয়?"

"তা হলে ঘটেছিলটা কী?"

"ওরে বোকা, উলটো করে ভাব। ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজুর কোয়ার্টারে। সেখানে হাড়, চামড়া ছাড়িয়ে পাটাতনে চাপিয়ে মাংসটা ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল ওই গর্তে।"

"তার মানে ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে ওরা আমাদের বাংলোর সামনে দিয়েই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ আমরা কিছু টের পেলাম না?"

"কী করে পাব? আমরা যে তখন সাতকোশিয়ায় আসিইনি।"

"মানে?" পার্থ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকাল, "কী হেঁয়ালি করছ, অ্যাঁ?"

"মোটেই হেঁয়ালি নয়, স্যার। ঘড়িয়াল দু'টোকে মারা হয়েছে আমরা এখানে আসার আগেই। রাজু যেদিন থেকে নেই, সেই দিনই। নিরালা বাংলোয় নিশ্চিন্তে অপারেশানটা চালিয়েছে সুবাহু, ইন্দ্রজিৎ, আর পূর্ণচন্দ্র।"

"যাহ বাবা, কী গুলগাপ্পি ঝাড়ছ? দু'দিন ধরে খাঁচায় যে ঘড়িয়াল দু'টোকে দেখলাম, সেগুলো তা হলে কি? মরা ঘড়িয়ালের ভূত?"

"প্রায় সেরকমই," মিতিন আলতো হাসল, "ওটাই সুবাহুর কেরামতি।"

"কীরকম?"

"কিছুই ঠিকঠাক অবজার্ভ কর না। পাশের ঘরে সিডি প্লেয়ার দেখে তোমাদের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। রাজুর কোয়ার্টারে দু'খানা ঘড়িয়ালের কঙ্কাল দেখে চমকে উঠলে। অথচ ড্রেসিংটেবিলের উপর পড়ে থাকা পলিথিনের বস্তুটির দিকে তোমরা ফিরেও তাকালে না।"

"তুমি কিসের কথা বলছ গো মাসি?"

"দু'খানা খেলনা ঘড়িয়ালের কথা বলছি। যাদের হাওয়া দিয়ে ফোলালে অবিকল আসল ঘড়িয়ালের মতোই দেখায়। সেগুলো এমনই নিখুঁত, বনবিভাগের যে-কোনও কর্মীও আসল-নকলের ফারাকটা বুঝতে পারবে না এবং এমনভাবে তৈরি, যে রিমোটের সাহায্যে মুখ খোলা-বন্ধও করা যায়।"

"ও-ও-ও। সুবাহুই বুঝি রিমোটটা অপারেট করত!"

"ইয়েস মিস ওয়াটসন," মিতিন সায় দিল, "থ্যাঙ্কস টু বুমবুম। ও আমাকে ক্লুটা দিয়েছিল। ওকে গিফট করব বলে পলিথিনের চোপসানো ঘড়িয়াল দু'টো আমি রেঞ্জারসাহেবের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছি। কেস মিটলে রিমোট সহ ওই দু'টো খেলনা উনি আমাকে পাঠিয়েও দেবেন।"

"ওটাই তা হলে তোমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ। অর্থাৎ কিনা খাঁচার ঘড়িয়াল দু'টোর রহস্য ভেদের জন্য তোমার পারিশ্রমিক?" পার্থ হেসে বলল, "কিন্তু কর্মবীর আর শক্তিধরের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করলেটা কখন?"

"আমার প্রতিটি স্টেপ তোমাদের না জানলেও চলবে," মিতিন হাসছে মিটিমিটি, "আমার সব চেয়ে মোক্ষম প্যাঁচটা ধরতে পেরেছ কি?"

"কোন্‌টা? রাতদুপুরে আচমকা হানা দেওয়া?"

"ঘেঁচু। ওই যে বিট অফিসারের কানে ভাসিয়ে দিলাম, রাজু কাল ফিরে আসছে, তাতেই তো রাতারাতি মাল সরানোর তাড়া পড়ে গেল। নয়তো ইন্দ্রজিৎ তো দিব্যি জ্বরো রোগীর ভান করে কাজটা ধীরেসুস্থে সারছিল।"

"রাজুর কোয়ার্টারে বসে?"

"নয়তো আর কোথায়! সাধে কি ওকে দেখা যাচ্ছিল না!" মিতিন চোখ ঘোরাল, "তবে বেচারার কাজটা আধখেঁচড়াই রয়ে গেল। চামড়া ও গিটারের বাক্সে ভরে ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু কঙ্কাল দু'টোকে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে উঠতে পারল না।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "চামড়ার নয় অনেক দাম। হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে কী হবে?"

"ঘড়িয়ালের হাড়ের গুঁড়োও বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিকোয়, বিশেষত চিনে। ওই হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে ওরা অনেক ওষুধবিষুধ বানায় কিনা।"

"ও।"

টুপুর যেন অবার খানিক উদাস। পরশুই মিতিনমাসি বলছিল, আর পাঁচটা সরীসৃপের মতোই ঘড়িয়ালের রক্ত ঠান্ডা। মানুষের মতো যে কোনও আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই ঘড়িয়ালদের। তাই পরিবেশের সামান্য বদল হলেই বেচারারা মারা পড়ে দলে-দলে। তার উপরে এভাবে যদি ক্রমাগত সুবাহু, ইন্দ্রজিৎদের মতো মানুষদের লোভের শিকার হয়, ধরাধাম থেকে প্রাণীটাই তো ধীরে-ধীরে মুছে যাবে। মানুষ কি নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দুনিয়ায় টিকতে দেবে না?

পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সকালের প্রথম সূর্য। লনের সবুজ ঘাস নরম হলুদ আলোয় মাখামাখি। তীক্ষ্ণ সুরে ডেকে উঠল একটা মাছরাঙা। মিশকালো ভীমরাজ নেচে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কত যে রংবেরঙের পাখি বেরিয়ে পড়েছে সেজেগুজে। টুপুর আনমনে সকালটাকে দেখছিল।

হঠাৎই বাংলোর বারান্দা থেকে বুমবুমের ডাক, "মা? ও'মা!"

রাতভর দিব্যি ঘুমিয়ে সদ্য জেগেছে বুমবুম। চোখ রগড়াচ্ছে।

টুপুর চেঁচিয়ে বলল, "কী রে, কিছু বলবি?"

"তোমরা ওখানে কী করছ?"

"প্রকৃতির শোভা দেখছি।"

বুমবুম বারান্দা থেকে নেমে এল। কাছে এসে বলল, "আমি কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

"কী রে?"

"ঘড়িয়াল দুটো তো জলে চলে গিয়েছিল, আবার ওরা জল থেকে উঠে এসেছে। আমি নদীর দিকে যাচ্ছি, ওরা আমার পাশে-পাশে যাচ্ছিল। আমি তাকালেই হাঁ করছে, চোখ ঘোরালেই মুখ বুজে ফেলছে," বুমবুম চোখ পিটপিট করছে, "ওরা খুব ভাল। তাই না মা?"

মিতিন নীরব। পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পার্থ। চলে যাচ্ছে বুমবুমের সামনে থেকে।

টুপুর যে এখন কী করে! তার এত কান্না পাচ্ছে কেন!